শেখ হাসিনার বারতা
নারী পুরুষ সমতা

বেগম রোকেয়া দিবস ২০২২

৯ ডিসেম্বর

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বেগম রোকেয়া দিবস ২০২২

৯ ডিসেম্বর

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পর্ষদ

আহ্বায়ক : ফরিদা পারভীন
মহাপরিচালক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

সদস্য : মো: তরিকুল আলম
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
'ইনকাম জেনারেটিং এ্যাকটিভিটিস অফ উইমেন এ্যাট উপজেলা লেভেল' শীর্ষক প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

মনোয়ারা ইশরাত
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

শারমিন আরা
সহকারী পরিচালক (ডোসিয়ার)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

সদস্য সচিব : মো: আলমগীর হোসেন
জনসংযোগ কর্মকর্তা
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রকাশনায়
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ ; ৯ ডিসেম্বর, ২০২২
[এই স্মরণিকায় ব্যবহৃত ছবি বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে সংগৃহীত]

‘বেগম রোকেয়া দিবস, ২০২২’ উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটি

আহ্বায়ক : **ফরিদা পারভীন**
মহাপরিচালক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রতিনিধি
বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা

সদস্য : **মো: তরিকুল আলম**
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
‘ইনকাম জেনারেটিং এ্যাকটিভিটিস অফ উইমেন এ্যাট উপজেলা লেভেল’ শীর্ষক প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি
ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন উইং)
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ বেতারের প্রতিনিধি
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মনোয়ারা ইশরাত
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

নাহিদ মঞ্জুরা আফরোজ
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

সত্যকাম সেন
যুগ্মসচিব (জামস)
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সালেহা বিনতে সিরাজ
অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

মো: হাবিবুর রহমান
মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ফরিদা খানম
উপ-পরিচালক (ম্যাজিস্ট্রেট)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

রুবিণা গনি
কর্মসূচি পরিচালক
মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

শারমিন আরা
সহকারী পরিচালক (ডোসিয়ার)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

সদস্য সচিব : **মো: আলমগীর হোসেন**
জনসংযোগ কর্মকর্তা
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

‘বেগম রোকেয়া দিবস, ২০২২’ উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের স্মরণিকা, ক্রোড়পত্র এবং বুকলেট সংক্রান্ত উপ-কমিটি

আহ্বায়ক :
মো: তরিকুল আলম
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
‘ইনকাম জেনারেটিং এ্যাকটিভিটিস অফ উইমেন এ্যাট উপজেলা লেভেল’ শীর্ষক প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

সদস্য :
মনোয়ারা ইশরাত
পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

মো: কেরামত আলী
উপ-প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
‘ইনকাম জেনারেটিং এ্যাকটিভিটিস অফ উইমেন এ্যাট উপজেলা লেভেল’ শীর্ষক প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

ফরিদা খানম
উপ-পরিচালক (ম্যাজিস্ট্রেট)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

মো: আবুল কাশেম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

মাহমুদা বেগম
উপ-পরিচালক (সচেতনতা)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

সৈয়দা নাসরীনা পারভীন
সহকারী পরিচালক (সচেতনতা)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

ডালিয়া মৌসুমী খান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন শাখা)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

সদস্য সচিব :
শারমিন আরা
সহকারী পরিচালক (ডোসিয়ার)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

বাংলার নারীজাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া-এঁর প্রতি আমাদের

শ্রদ্ধাঞ্জলি

بسم الله الرحمن الرحيم

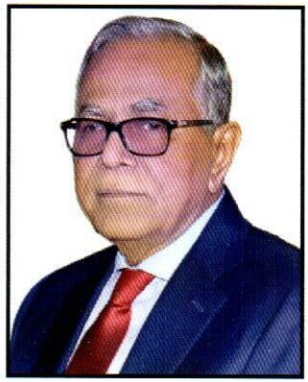

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৯
০৯ ডিসেম্বর ২০২২

'বেগম রোকেয়া দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে আমি নারীজাগরণের অগ্রদূত মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। দিবসটি উপলক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বেগম রোকেয়া পদক প্রদানের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া ছিলেন একাধারে একজন চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক। বাঙালি সমাজ যখন ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা আর সামাজিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই সময় তিনি বাংলার মুসলিম নারীসমাজে শিক্ষার আলোকবর্তিকা হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি নারী শিক্ষার প্রসারে আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। বৈষম্যহীন ও সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে বেগম রোকেয়ার আদর্শ, সাহস ও কর্মময় জীবন নারীসমাজের জন্য এক অন্তহীন প্রেরণার উৎস।

সরকার নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বে রোল মডেল। রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, আইনপেশা, প্রশাসন, সশস্ত্র বাহিনী, অর্থনীতি, সাংবাদিকতা, শিল্প-সংস্কৃতি ও খেলাধুলাসহ পেশাভিত্তিক সকল ক্ষেত্রে নারীদের আজ গর্বিত পদচারণা। নারীর এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে রাষ্ট্রের পাশাপাশি পরিবার ও সমাজের সার্বিক সমর্থন ও সহযোগিতা অতীব জরুরি বলে আমি মনে করি। বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

নারী ও সমাজ উন্নয়নে অনন্য অবদান রাখার জন্য যাঁরা এ বছর 'বেগম রোকেয়া পদক ২০২২' পেয়েছেন, আমি তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তাঁদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যরাও এগিয়ে যাবে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে– বেগম রোকেয়া দিবসে এ আমার প্রত্যাশা।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

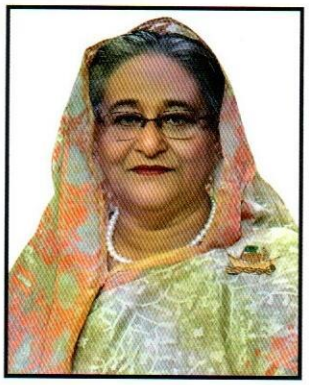

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৯
০৯ ডিসেম্বর ২০২২

বাণী

'বেগম রোকেয়া দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে আমি বাঙালি নারী শিক্ষার প্রসার ও নারীজাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। এ বছর যাঁরা 'বেগম রোকেয়া পদক ২০২২' পেয়েছেন, আমি তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বেগম রোকেয়া ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন আধুনিক নারী। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সমাজ তথা রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। তাঁর এই উপলব্ধি ও আদর্শ আজও আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়।

বাংলাদেশের নারী শিক্ষার প্রসার ও নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র বিনির্মাণে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন পথিকৃৎ। তিনি বিশ্বাস করতেন দেশকে এগিয়ে নিতে হলে এবং সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হলে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা ছাড়া তা সম্ভব নয়। তাই তিনি নারীর সমান অধিকার, সমমর্যাদা, সাম্য ও স্বাধীনতার অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে সংবিধানে নারীর ক্ষমতায়নের শক্ত ভিত রচনা করেছিলেন। জাতির পিতা জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখার বিধান করেন; চাকরি ক্ষেত্রে নারীদের জন্য শতকরা ১০ ভাগ কোটা সংরক্ষণ করেন এবং ১৯৭৩ সালে তাঁর গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারীর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নারীকে সম্পৃক্ত করতে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ধারণাকে বাস্তবায়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমাদের সরকার জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে আর্থসামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতে ও জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। নারীবান্ধব বাজেট প্রণয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে বিভিন্ন ভাতা প্রদান ও কর্মমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। নারী উন্নয়ন নীতিমালাসহ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কঠোর আইন প্রণয়ন ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ কাজের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।

আমাদের সরকার নারীর মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি সর্বত্র নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। ফলে বাংলাদেশের নারীরা এখন নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বমহিমায় ও সক্ষমতায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর সফল বাস্তবায়নসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে সফলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতি তথা সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারীর অবস্থান এখন সাবলীল এবং সুদৃঢ়। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অবস্থান আজ বিশ্বে ৭ম। আমাদের স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের প্রায় ৭০ শতাংশ নারী, তৈরি পোশাক কর্মীদের ৮০ শতাংশের বেশি নারী এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে নারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। বর্তমানে সংরক্ষিত আসন ও নির্বাচিত ২২ জনসহ ৭২ জন নারী সংসদ সদস্য রয়েছেন। স্থানীয় পর্যায়ে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির সংখ্যা ১০ হাজারের অধিক। ক্ষমতায়নের অন্যান্য ক্ষেত্র, যেমন- প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও বিচার বিভাগেও নারীর পদচারণা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। সহস্রাধিক নারী সেনা ও পুলিশ কর্মকর্তা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে দায়িত্ব পালন করে লাল-সবুজের পতাকার মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। আমাদের নারীরা আজ বিচারপতি, সচিব, রাষ্ট্রদূত, মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন, ডেপুটি গভর্নর, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করছে। নিজেদের মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে নারীরা তাঁদের এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নারী উন্নয়নের স্বীকৃতি হিসেবে আমরা জাতিসংঘের 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন'সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছি। বাংলাদেশ আজ নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বিশ্বের কাছে অনুকরণীয়। এদেশে সফল হয়েছে বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন।

আমি মনে করি, বৈষম্যহীন ও সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে বেগম রোকেয়ার জীবনাদর্শ ও নারী শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদান আমাদের নারী সমাজের অগ্রযাত্রায় এক অন্তহীন প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আমি 'বেগম রোকেয়া দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কমনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রতিমন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তির অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপন এবং বেগম রোকেয়া পদক ২০২২ প্রদানের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে বিশ্বের সকল নারীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন উপমহাদেশের নারীজাগরণের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় নাম। তিনি নারী শিক্ষায় বাংলার নারীসমাজের নিকট এক আলোকবর্তিকা। নারীদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি আদর্শ ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছেন। তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতিমান বাংলা সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক। নারীরা যখন কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিধি-নিষেধের জালে বন্দি, তখন তিনি আবির্ভূত হন অবরোধবাসিনীদের মুক্তিদূত হিসেবে। তিনি লিখেছেন, ''যাহা হউক মাতা, ভগিনী, কন্যা? আর ঘুমাইও না উঠ, কর্তব্য পথে অগ্রসর হও।'' তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল নারীদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা। ফলে কুসংস্কার ও অবরোধ প্রথার অবসানের মাধ্যমে অর্জিত হবে নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপলব্ধি করেছিলেন জনসংখ্যার অর্ধেক নারীকে বাদ দিয়ে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। সে লক্ষ্যে জাতির পিতা সংবিধানে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করেন। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসন করেন। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বলিষ্ঠ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যার ফলে বাংলাদেশে নারীর অগ্রগতি আজ বিশ্বে দৃশ্যমান। বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বে রোল মডেল সৃষ্টি করেছে। সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও জেন্ডার গ্যাপ সূচকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শীর্ষে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব অবদানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিস্বরূপ 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন', 'পিস ট্রি', 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড', 'সাউথ-সাউথ', 'গ্লোবাল উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' ও এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নির্দেশনায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ মন্ত্রণালয় নারী ও শিশুর উন্নয়নে ভিডব্লিউবি, মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি, ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কর্মজীবী হোস্টেল, শিশু বিকাশ ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করছে। নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানের জন্য ৬৪টি জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও সেল স্থাপন করা হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০২০ এ ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হয়েছে। তাছাড়া ধর্ষণে অভিযুক্ত ব্যক্তি ও অভিযোগের শিকার ব্যক্তির ডিএনএ পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নারী ও শিশুর উন্নয়ন, সুরক্ষা এবং আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০; ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন ২০১৪; বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭, যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮ ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১; নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০৩০ এবং বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০৩০ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আজকের নারীরা বেগম রোকেয়ার জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। এ বছর নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে যাঁরা 'বেগম রোকেয়া পদক ২০২২' পেয়েছেন, তাঁদেরকে আমি জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আমি বেগম রোকেয়া দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি

সচিব

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাণী

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এক মহীয়সী নারীর নাম। বাঙালি মুসলিম নারীজাগরণের অগ্রদূত। মহীয়সী এ নারীর জন্ম ও প্রয়াণ দিবসে তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

বেগম রোকেয়ার কর্মময় আদর্শ জীবন নিরন্তর অনুসরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর ০৯ ডিসেম্বর রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপন এবং বিশিষ্ট নারীদের অনন্য অর্জনের জন্য 'বেগম রোকেয়া পদক' প্রদান করে থাকে। বেগম রোকেয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এ বছর যাঁরা নারী ও সমাজ উন্নয়নে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বেগম রোকেয়া পদকে ভূষিত হয়েছেন, তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

বাংলার মুসলিম নারীজাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ছিলেন বাংলার মুসলিম নারীসমাজের আলোকবর্তিকা। বঙ্গ ভারতের সমাজ যখন অশিক্ষা ও কুসংস্কারের আঁধারে নিমজ্জিত, অবরোধ ও অবজ্ঞায় এদেশের নারীসমাজ যখন জর্জরিত, সে তমসাচ্ছন্ন যুগে বেগম রোকেয়ার ন্যায় একজন মহীয়সী নারীর আবির্ভাব ঘটে। পুরুষশাসিত সমাজের আচার-অনাচার, কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছেন বেগম রোকেয়া। মুসলিম মেয়েদের প্রগতির জন্য তিনি সারাজীবন কাজ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন মেয়েদের সাবলম্বী হবার পথে, মুক্তির পথে শিক্ষার বিকাশই আসল পথ।

বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের ইতিহাসে বেগম রোকেয়ার অবদান চিরন্তন। সাহিত্যিক হিসেবে তৎকালীন যুগের প্রেক্ষাপটে রোকেয়া ছিলেন এক ব্যতিক্রমী প্রতিভা। রোকেয়ার সমগ্র সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে সমাজের কুসংস্কার ও অবরোধ প্রথার কুফল, নারী শিক্ষার পক্ষে তাঁর নিজস্ব মতামত, নারীদের প্রতি সামাজিক অবমাননা এবং নারীর অধিকার ও নারীজাগরণ। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধেও তাঁর লেখা ছিল সোচ্চার।

উন্নয়নের মহাসড়কে আমাদের গতি এখন অপ্রতিরোধ্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশের অর্থনীতির পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘটেছে অবিশ্বাস্য পরিবর্তন। বদলে যাওয়া এ বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নও ঘটেছে প্রশ্নাতীতভাবে। কয়েক দশক আগেও বলতে গেলে গৃহবন্দি নারী এখন অর্থনীতি-রাজনীতির বলিষ্ঠ নিয়ন্ত্রক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন ভাবনার বড় অংশজুড়ে রয়েছে নারীমুক্তি ও নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর চূড়ান্ত স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নে আমাদের এখনও অনেক পথ যেতে হবে। তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের সামনে যে রূপকল্প উপহার দিয়েছেন, তাতে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ার কোনো সুযোগ নেই। অর্থনৈতিক, সামাজিক মুক্তির পাশাপাশি আমরা নারীমুক্তি; সর্বোপরি মানবমুক্তি ঘটানোর লড়াইয়ের জন্য এখন পুরোপুরি তৈরি।

উন্নয়নের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ নির্মূল, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন ও বিকাশ, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ও প্রধানমন্ত্রীকে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, দর্শন চিন্তা, মানবিক ও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ও সমাদৃত হচ্ছে। ফলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হচ্ছে।

বেগম রোকেয়ার কর্ম ও আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে শতাব্দীর নারীর সফল অগ্রযাত্রা। নারীর মানবাধিকার রক্ষা, ন্যায্য অধিকার প্রদান, ক্ষমতায়ন ও মর্যাদা নিশ্চিতকল্পে একটি সমতাভিত্তিক বিশ্ব গড়ে তোলার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বেগম রোকেয়া দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন ও বেগম রোকেয়া পদক-২০২২ প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল

সূচিপত্র

বাঙালির জাগরণে রোকেয়ার আত্মশক্তি ❙ সেলিনা হোসেন-১৯
তোমার ইস্কুল ❙ কামাল চৌধুরী- ২৩
শীতের বাগান হবে ❙ হাসান কল্লোল-২৪
আপন আলোয় উদ্ভাসিত-বেগম রোকেয়া ❙ লাকী ইনাম-২৫
একাকী পথ চলার সাহসী পথিক ❙ আনোয়ারা সৈয়দ হক-২৭
জাগো বঙ্গবাসী ❙ আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক-৩০
স্বপ্ন-দিশারি বেগম রোকেয়া ও নারীসমাজ ❙ ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ -৩৩
নারী জাতির অহংকার-বেগম রোকেয়া ❙ বেগম চেমন আরা তৈয়ব-৩৭
শতাব্দীর শ্বেতপদ্ম ❙ ফরিদা পারভীন-৩৮
রোকেয়ার মতো নারী ❙ ফারুক হোসেন-৪০
মাতৃভূমির সমস্ত মাটিকে ❙ নির্মলেন্দু গুণ-৪১
সূর্যপরশা ❙ রাম চন্দ্র দাস-৪৩
রোকেয়ার ভাবনায় বর্তমান: পরিপ্রেক্ষিত-প্রাসঙ্গিকতায় একবিংশ শতাব্দী ❙ ড. তানিয়া হক-৪৪
বেগম রোকেয়া: নারীজাগরণের পথিকৃৎ ❙ জাকিয়া কে হাসান-৪৮
বেগম রোকেয়া: সমতা ও অগ্রগতির প্রতীক ❙ রঞ্জন কর্মকার-৫১
বাংলার নারীজাগরণ ও নারী শিক্ষার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ❙ সুরমা জাহিদ-৫৪
বেগম রোকেয়া ও নারী উন্নয়ন ❙ ড. শেখ মুসলিমা মুন-৫৭
‘আপনি শক্তির নাম, গৌরবের উৎস-বেগম রোকেয়া’ ❙ নাসিমা আক্তার নিশা-৫৯
বেগম রোকেয়ার স্বপ্নের প্রজাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ❙ ড. মাহবুবা রহমান-৬১
নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনে বেগম রোকেয়া ❙ মফিদা বেগম-৬৪
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের কিছু আলোকচিত্র ❙ ৬৭
বেগম রোকেয়ার পারিবারিক অ্যালবাম থেকে ❙ ৭৩
২০২২ সালে বেগম রোকেয়া পদকে ভূষিত সম্মানিত ব্যক্তিগণ ❙ ৭৪
১৯৯৫ সাল থেকে ২০২২ পর্যন্ত বেগম রোকেয়া পদকে ভূষিত সম্মানিত ব্যক্তিগণের নাম ❙ ৭৫

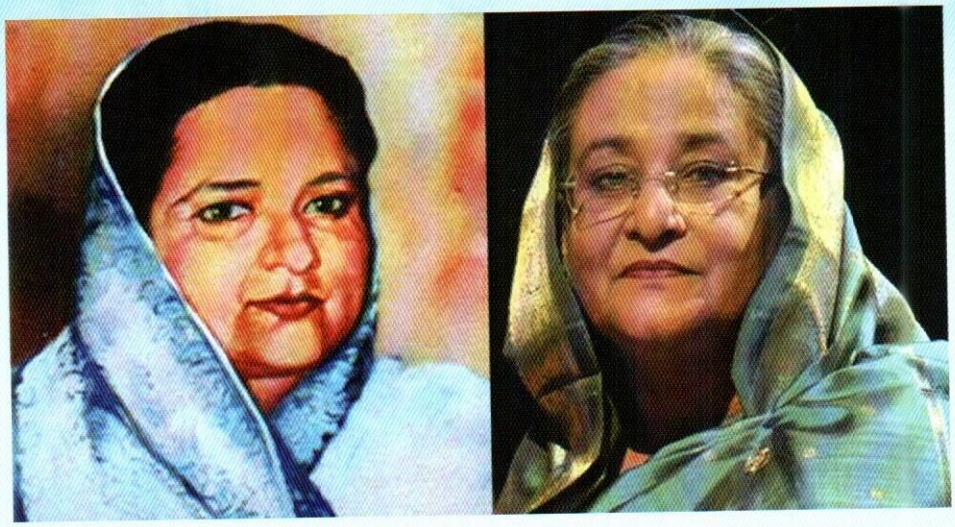

বাঙালির জাগরণে রোকেয়ার আত্মশক্তি

সেলিনা হোসেন

এক

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন উপমহাদেশের প্রথম নারীবাদী লেখক হিসেবে একটি সুনির্দিষ্ট অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। পাশাপাশি মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর সুদূরপ্রসারী অভিজ্ঞান একটি দিকনির্দেশনার সূচনা করেছিল। তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য অভিভাবকদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন। সমাজ উন্নয়নে শিক্ষার মর্যাদাকে বীজ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

মোশফেকা মাহমুদ সংকলন করেছিলেন 'পত্রে রোকেয়া পরিচিতি'। এ বইয়ে রোকেয়ার ১৩টি চিঠি আছে। একটি চিঠিতে তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের বাংলাদেশ, আহা রে! আমি যদি কিছু টাকা (ধর, মাত্র দুই লক্ষ) পাইতাম, তবে কিছু করিয়া দেখাইতে পারিতাম।' স্কুল প্রতিষ্ঠা করার পরও রোকেয়ার স্বপ্নের শেষ ছিল না। তিনি মেয়েদের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। পিছিয়ে পড়া নারীসমাজের জন্য তাঁর ভূমিকা ছিল আলোক শিখার, সেই আলো এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের নারীদের জীবনে ভীষণ জরুরি।

নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির চিন্তায় 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' স্থাপন করে মেয়েদের কুটিরশিল্পে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন, 'আমরা অকর্মণ্য পুতুল জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, এ কথা নিশ্চিত।' তিনি আরো বলেছেন, 'কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিত করিয়া কার্য ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও- নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক'। নারী-পুরুষের সমঅধিকারের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন: 'নারী-পুরুষ সমাজদেহের দুটি চক্ষুস্বরূপ। মানুষের সব রকমের কাজকর্মের প্রয়োজনেই দুটি চক্ষুর গুরুত্ব সমান।' আরও বলেছেন, 'তাহাদের জীবন শুধু পতি-দেবতার মনোরঞ্জনের নিমিত্তে উৎসর্গ হইবার বস্তু নহে! তাহারা যেন অন্নবস্ত্রের জন্য কাহারও গলগ্রহ না হয়।' আর মেয়েদেরকে নিজেদের দৃষ্টি খুলতে বলেছেন: 'ভগিনীগণ! আপনারা স্বীয় কারাগারের ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ দিয়া উঁকি মারিয়া একবার বাহিরের জগৎ দেখুন দেখি!' শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা যেমন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তির জন্য জরুরি, তেমনি জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের জন্যও প্রাথমিক ধাপ। এই দুই জায়গায় রোকেয়া যে নিজস্ব চিন্তার আলো ফেলেছিলেন, এখন থেকে একশ বছর আগে, আজকের পৃথিবীতে তা জেন্ডার সমতার জায়গা বিশ্লেষণের মৌলিক সূত্র। জেন্ডার সমতার যে সমাজমনস্ক চিন্তা পরিব্যাপ্ত হয়েছে, কোনো তাত্ত্বিক উদ্ভাবন ছাড়াই রোকেয়া তাঁর আপন জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় অনুধাবন করেছিলেন। তিনি গত শতাব্দীর শুরুর দিকে যখন এই জায়গাগুলো চিহ্নিত করেছিলেন, তখন জেন্ডার ধারণার জ্ঞান একাডেমিক জগতে প্রবেশ করেনি। এখানেই রোকেয়াকে স্মরণ করার যৌক্তিক অনুশীলন প্রতিষ্ঠিত হয়।

দুই.

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে জেন্ডার প্রত্যয়টি একটি উন্নয়ন ইস্যু। প্রমাণিত হয়েছে যে, নারী-পুরুষের সমান অংশীদারিত্ব ব্যতীত টেকসই উন্নয়ন করা কঠিন। কারণ, নারী-পুরুষের জেন্ডার ভূমিকা নির্ধারিত হয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক আলোকে। সেক্স নারী-পুরুষের লিঙ্গ নির্ধারণ করে, আর জেন্ডার নারী-পুরুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্ধারণ করে। তাই সমাজের অর্ধেক জনশক্তি নারীকে পাশ কাটিয়ে উন্নয়ন ধারণা নির্ণয় করা যে সঠিক নয়, তা গবেষণা এবং বাস্তব ভূমিকায় উঠে এসেছে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণার পরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু বিষয়টি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঠিকভাবে বিবেচিত হয়নি। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অবস্থান কী হবে– এটিও নির্দিষ্ট হতে অনেক সময় লেগেছে। দীর্ঘ সময় ধরে এমন ধারণা প্রচলিত ছিল যে, সমাজের একটি অংশ অর্থাৎ পুরুষ উপকৃত হলে নারীও তার সুফলভোগী হবে।

সময়ের বিবর্তনে পুরুষ রচিত ইতিহাস উন্নয়নে নারীর অবদানকে মূল্যায়ন না করে অদৃশ্য করে রেখেছিল। ১৯৫০-৬০-এর দশকে উন্নয়নে নারী ইস্যুকে মানবাধিকার ইস্যু হিসেবে চিন্তা করা হতো। উন্নয়নে প্রত্যক্ষ কর্মকাণ্ডে

অংশগ্রহণকারী হিসেবে না দেখে নারীকে পরোক্ষ উপকারভোগী হিসেবে দেখা হতো। সেজন্য নারী বিষয়ক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নীতিনির্ধারণী আলোচনায় নারীদের ডাকা হতো না। যদিও জাতিসংঘ নারী বিষয়ে বিভিন্ন সনদ গ্রহণ করেছিল। ১৯৪৬ সালে Commission on the Status of Women; ১৯৪৯ সালে Convention for the Suppression of Traffic in Persons and the Exploitation of the Prostitution of Others; ১৯৫১ সালে Equal Remuneration of Men and Women Workers for Work of Equal Value; ১৯৫২ সালে Convention on the Political Rights of Women গৃহীত হয়েছিল।

সত্তর দশকে জনসংখ্যা ও খাদ্য বিষয়ক ইস্যুতে উন্নয়ন ধারণায় নারীর অবস্থান প্রবলভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। ইসথার বোসপার তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছিলেন, আফ্রিকার ঔপনিবেশিক শাসকরা কীভাবে নারীকে খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। শাসকদের হস্তক্ষেপের আগে সেসব অঞ্চলের নারীরা ছিল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সক্রিয় কৃষক, আর হস্তক্ষেপের ফলে নারী হয়ে যায় পুরুষের ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্য বা সহায়ক। নারীকে এভাবে অবদমিত না করে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যথাযথভাবে যুক্ত করাই টেকসই উন্নয়নের অন্যতম শর্ত। একই সঙ্গে অর্জিত হবে জেন্ডার সমতার জায়গা।

ক্ষমতায়ন নারী-পুরুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনমান অর্জনের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ, ব্যক্তির নিজ জীবন ব্যক্তি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে তা ঠিক করার পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করা। ক্ষমতায়ন ব্যক্তির ভেতরে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করে, যার দ্বারা সে সমস্যা সমাধান করতে শেখে। পরমুখাপেক্ষী না হয়ে, স্বনির্ভর হয়ে। এভাবে একজন নারী বা পুরুষ যখন জীবন জিজ্ঞাসার মতামত গ্রহণে ক্ষমতার অধিকারী হয়, তখন মনে করা হয় তার ক্ষমতায়ন হয়েছে।

রোকেয়ার 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থ নারীবাদী তাত্ত্বিক কেট মিলেটের অসাধারণ উক্তি 'পারসোনাল ইজ দ্য পলিটিক্যাল'-এর সমার্থক। 'অবরোধবাসিনী'র ৪৭টি এপিসোড মুসলিম নারীর সামাজিক অবস্থানের নিদারুণ বয়ান। প্রথম এপিসোডেই তিনি বলেছেন: 'এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, গোটা ভারতবর্ষে কুলবালাদের অবরোধ কেবল পুরুষদের বিরুদ্ধে নহে, মেয়েমানুষদের বিরুদ্ধেও।' তিনি বলেছেন: 'কত মজলুমা ভগ্নহৃদয়ে আমাদের দেশে অন্তঃপুরের নিভৃতকোণে নিহতা হন, কে তাহার সন্ধান লয়? সে তাপদগ্ধা অভাগিনীদের উদয়বিলয় কোনো ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকে না।' রাজনীতির পুরুষতন্ত্র নারীকে তার আপন বলয়েও সুস্থ থাকতে দেয় না। একশ বছর আগে রোকেয়া যে ঘটনার বর্ণনা করে পুরুষতন্ত্রের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, কেট মিলেট পঞ্চাশ বছর পরে তার ভিন্ন খোলসের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। এখানে নারীর যৌনতার বিশুদ্ধ বিবরণ আফ্রিকার নারীর খৎনার কাছে বাঁধা পড়ে। ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়েছে নারীর অবস্থান। সব মিলিয়ে সেটা খানিকটুকু পরিবর্তন মাত্র, বড় পরিসরের অর্জন নয়।

তিন.

ক্ষমতায়ন কার্যকরী করার জন্য তিনটি পর্যায়কে বিবেচনা করা হয়। প্রথমটি ব্যক্তিগত। এই পর্যায়ে বিবেচিত হয় ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও সামর্থ্যের ধারণা। দ্বিতীয়টি সম্পর্ক। এই পর্যায়ে দেখা হয় ব্যক্তির সম্পর্কযুক্ত ক্ষমতার সামর্থ্য। অর্থাৎ ব্যক্তি কতটা মধ্যস্থতাকারী ও অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তারে কতটা সমর্থ। তৃতীয়টি সামষ্টিক। এই পর্যায়ে বিবেচিত হয় একসঙ্গে কাজ করার দক্ষতা।

বেগম রোকেয়া উন্নয়ন বলতে বুঝেছিলেন নারী-পুরুষের সামগ্রিক উন্নয়ন। পিছিয়ে থাকা নারীসমাজকে জেগে উঠতে বলেছেন। এক কাতারে আসতে বলেছেন। তিনি উন্নয়ন ব্যবস্থার সামগ্রিক বোধটিকেও দেখেছিলেন জনগোষ্ঠীর মানসলোকের আলোকে। দেখেছিলেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলোর স্বরূপ বিশ্লেষণের মাঝে। তাঁর মৃত্যুর ৭৯ বছর পূর্ণ হয়েছে। তারপরও তাঁর রচনার অন্তর্গত গূঢ় দিক নতুন আবিষ্কারের দাবি রাখে। তাঁর রচনা পাঠ করার সময়ে প্রতিবারই তিনি চিন্তার ভিন্ন দরজা খুলে দেন। দেখা যায় জীবন ও সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁর চিন্তার জায়গাটি কত স্বচ্ছ।

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'রোকেয়া রচনাবলী' গ্রন্থে (১৯৭৩) 'পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত প্রবন্ধাবলী' শীর্ষক একটি অধ্যায় আছে। এই অধ্যায়ে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে লেখা প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম 'চাষার দুক্ষু', 'এন্ডি শিল্প', 'রাঙ ও সোনা', 'সুবেহ সাদেক', 'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম', 'হজের ময়দান', 'নিরীহ বাঙালী' ইত্যাদি।

এইসব লেখায় তীক্ষ্ণ মন্তব্য আছে, ব্যঙ্গ আছে, শানিত বিদ্রুপের তিক্ততা আছে। ক্ষোভ আছে। 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'কেবল কলিকাতাটুকু আমাদের গোটা ভারতবর্ষ নহে এবং মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি সমস্ত ভারতের অধিবাসী নহে। অদ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়, চাষার দারিদ্র্য। চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড।' কৃষিনির্ভর অর্থনীতির মূল জায়গাটি ধরে তিনি এগিয়েছেন। বলেছেন: 'সাতভায়া নামক সমুদ্র তীরবর্তী গ্রামের লোকেরা পখাল (পান্তা) ভাতের সহিত লবণও জুটাইতে পারিত না।' লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৮ বঙ্গাব্দে। এখন থেকে ৮৭ বছর আগে। রোকেয়া অর্থনীতির মূল জায়গাটি বুঝতে ভুল করেননি। কৃষি যদি জাতির অর্থনীতির মেরুদণ্ড হয় তবে সেই শ্রমজীবী চাষিকে খাদ্যের সমতা দিতে হবে। সমতা দিতে হবে চাষির পুরো পরিবারকে। কারণ, একজন গৃহিণীর ধান থেকে চাল বানানো পর্যন্ত অনেক রকম কাজ থাকে, যেটুকু না করলে চাল উৎপাদন প্রক্রিয়া পূর্ণ হয় না। এসব জায়গায় জেন্ডার বৈষম্য ঘটলে জাতি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পিছিয়ে পড়ে। বেগম রোকেয়া সমস্যাটি গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। একইভাবে তিনি 'এন্ডি শিল্প' প্রবন্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এন্ডি গুটি আবাদের ১১টি প্রণালির কথা বলেছেন। কীভাবে এই শিল্প নষ্ট হয়েছে সেকথা বিশ্লেষণ করেছেন। এই শিল্প উপেক্ষা করার ফলে নারী কতভাবে

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে কথা বলেছেন। এই শিল্পের যথাযথ পরিচর্যা করলে নারী-পুরুষ কতভাবে উপকৃত হতো সে কথাও বলেছেন। অর্থনীতির এই জায়গাটি বোঝার জ্ঞান তাঁর ছিল পারিপার্শ্বিক মূল্যায়ন করে আপন চিন্তার আলোকে। কোনোভাবে পুঁথিগত বিদ্যা থেকে নয়। এ কারণেই রোকেয়া মহীয়সী নারী। তিনি বলেছেন: 'পল্লী গ্রামে সুশিক্ষা বিস্তারে চেষ্টা হওয়া চাই। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আর ঘরে ঘরে চরকা ও টেকো হইলে চাষার দারিদ্র্য ঘুচিবে।' জেন্ডার ধারণায় পরিষ্কারভাবে বলেছেন, 'সমাজের অর্ধ অঙ্গ বিকল রাখিয়া উন্নতি লাভ করা অসম্ভব।'

চার.

১৭৯২ সালে Mary Wollstonecraft-এর 'আ ভিন্ডিকেশন অব দ্য রাইটস অব ওম্যান' প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের ভূমিকায় মেরি এক জায়গায় নারীর পিছিয়ে থাকার কারণ হিসেবে শিক্ষার অব্যবস্থার কথা বলেছেন। নারী যে ঠিকমতো বিকশিত হতে পারে না তার আর একটি কারণ হিসেবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে দায়ী করেছেন, যেখানে পুরুষ ...considering females rather as women than human creatures... ।'

রোকেয়া ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলের শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি পূর্ণভাবে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। শিক্ষাকে তিনি দেখেছেন জনগোষ্ঠীর জীবন রূপান্তরের মূল জায়গা থেকে। তিনিও পুরুষতন্ত্রের স্বরূপটি ঠিকই উপলব্ধি করেছিলেন। বলেছেন: 'পুরুষগণ আমাদিগকে সুশিক্ষা হইতে পশ্চাৎপদ রাখিয়াছেন বলিয়া আমরা অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছি' (অর্ধাঙ্গী)। বলেছেন: 'অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনী।' এই জেগে ওঠার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষা। বলেছেন: 'ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মনঃ এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, হস্ত দ্বারা সৎকার্য করি, চক্ষু দ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন (বা observe) করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করি এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি–তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল 'পাশ করা বিদ্যা'-কে প্রকৃত শিক্ষা বলি না (স্ত্রীজাতির অবনতি)। শিক্ষার এই জায়গাকে অবলম্বন করে বলেছেন : 'আমি ইতঃপূর্বেও বলিয়াছি যে, 'নর ও নারী উভয়ে মিলিয়া একই বস্তু হয়। তাই একটিকে ছাড়িয়া অপরটি সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না।' এখনো তাহাই বলি এবং আবশ্যক হইলে ঐ কথা শতবার বলিব।' (বোরকা)। মেরি উলস্টোনক্রাফট একই ভাষায় বলেছেন, if women do not grow wiser in the same ratio, it will be clear that they have weaker understandings.

এই প্রতিধ্বনি রোকেয়া নিজের মনন থেকেই উচ্চারণ করেছেন। বলেছেন, 'পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী-কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী-ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী-ব্যারিস্টার, লেডী-জজ-সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী Viceroy হইয়া এ দেশের সমস্ত নারীকে 'রানী' করিয়া ফেলিব। উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা 'স্বামী'র গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না? আমরা যদি রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব।' (স্ত্রী জাতির অবনতি)

পাঁচ.

একটি রক্ষণশীল পরিবারের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে নিজের চারপাশকে পর্যালোচনা করার দক্ষতা একজন সমাজসচেতন মানুষের পক্ষেই সম্ভব। রোকেয়া নিজের পরিধি এভাবে প্রসারিত করেছেন। নারীবাদী বোধের জায়গাটিকে তিনি সামগ্রিক ব্যবস্থা থেকে আলাদা করে দেখেননি। চাষার দারিদ্র্যের সঙ্গে নারীর দুর্গতি যেমন দেখেছেন, তেমনি এন্ডি শিল্পকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাও যে কত জোরালো সেটাও তিনি সমানভাবে এনেছেন। এসব ভাবনার মধ্য দিয়ে রোকেয়া জনগোষ্ঠী, সমাজ এবং দেশের বিবেক সচেতন মানুষ।

'নিরীহ বাঙালী' প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি লিখেছেন, 'আমরা দুর্বল নিরীহ বাঙ্গালী। এই বাঙ্গালী শব্দে কেমন সুমধুর তরল কোমল ভাব প্রকাশ হয়।' এই প্রকাশ তাঁর সমালোচনার ভাষা। বাঙালির এই বাঙালিয়ানাকে তিনি প্রশংসা করেননি। প্রবন্ধের সর্বত্র তিনি নমনীয় অথচ তির্যক ভাষায় দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে বাঙালি তার মৌলিক জায়গা থেকে সরে গেছে। বাঙালি কত সহজভাবে কাজ নির্বাহ করে তার আটটি কারণ চিহ্নিত করেছেন তিনি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– ১. রাজ্য স্থাপন করা অপেক্ষা 'রাজা' উপাধি লাভ সহজ; ২. দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য পরিশ্রম করা অপেক্ষা, আমেরিকার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করা সহজ; ৩. স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান হওয়া অপেক্ষা স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ঔষধ ও ডাক্তারের হস্তে জীবন সমর্পণ করা সহজ ইত্যাদি।

'সুবেহ সাদেক' একটি ক্ষুরধার প্রবন্ধ। সুবেহ সাদেকের সময় মোয়াজ্জিন আজান দেন। তিনি আজানের ধ্বনির সঙ্গে নারীর জেগে ওঠার চমৎকার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। তিনি লিখেছেন– 'ভগিনীগণ! চক্ষু রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন– অগ্রসর হউন। বুক ঠুকিয়া বল মা! আমরা পশু নই। বল ভগিনী! আমরা আসবাব নই। বল কন্যে! জড়োয়া অলঙ্কার রূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই। সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ।' প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে, এখন থেকে ৮০ বছর আগে। এখনো সমাজের মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষেরা চিৎকার করছেন নারীকে 'মানুষ' বলার দাবিতে। ৮০ বছর পরেও তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি না করে এই সময়ের নারীদের উপায় নাই।

মানুষ হিসেবে মর্যাদার দাবিকে সমুন্নত করার জন্য রোকেয়া শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। একই প্রবন্ধে লিখেছেন, 'শিক্ষা বিস্তারই এইসব অত্যাচার নিবারণের একমাত্র মহৌষধ। অন্ততপক্ষে বালিকাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতেই হইবে। শিক্ষা অর্থে আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই বলি; গোটা পুস্তক পাঠ

করিতে বা দু'ছত্র কবিতা লিখিতে পারা শিক্ষা নয়। আমি চাই সেই শিক্ষা যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভের সক্ষম করিবে।' মানুষ হিসেবে মানুষকে ধর্মের ঊর্ধ্বে চিন্তা করার অসাম্প্রদায়িক দিকটিও তিনি ভোলেননি। বলেছেন, 'এমন শুভদিনে আমরা আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃদ্বয়কে ভুলিয়া থাকি কেন? সমুদয় বঙ্গবাসী একই বঙ্গের সন্তান নহেন কি?' তিনি আরো উদ্ধৃত করেছেন, 'যখন হিন্দু-মুসলমান, পারসি-খ্রীষ্টান, জৈন-ইহুদীতে এবং বৌদ্ধ-শিখে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে আলিঙ্গন হইবে, তখন আমি মনে করিব যে, ধর্মের জয় এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পবিত্র নাম শান্তিপ্রদ হইয়াছে।'

এভাবেই তাঁর জীবনদর্শন এবং কর্মযজ্ঞ সুনির্দিষ্ট এবং স্বচ্ছ। নারীদের জন্য তিনি দুটি বিষয়কে পরিষ্কার করেছেন। একটি নাগরিক অধিকার, যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমুন্নত করে। জেন্ডার সমতার ভিত্তি রচনা করে। অন্যটি অন্নবস্ত্র অর্জনে সক্ষমতা, যা নারীর অর্থনৈতিক ভিত্তিকে মজবুত করে।

'সুবেহ্ সাদেক' প্রবন্ধে যে দুটি গভীর বিষয় তিনি নারীর জন্য নির্ধারণ করেছেন, তা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় তা শুধু নারীর জন্যই প্রযোজ্য নয়। এই দুটি মৌল সত্য নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য অবধারিত।

শিক্ষা নাগরিক অধিকার বোঝার ক্ষেত্রে পুরুষের জন্যও অন্যতম পথ। অন্যদিকে পুরুষেরও দায়িত্ব আছে অন্নবস্ত্রের জন্য অন্যের গলগ্রহ না হওয়া। অন্যের গলগ্রহ হওয়া পুরুষের জন্যও অবমাননাকর। তা আত্মশক্তির বিকাশ ঘটায় না। বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যায় যে, অধিকার সচেতনতা এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতা জীবনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই দুই সত্য রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে দৃঢ় করে এবং নীতিনির্ধারণের জায়গা থেকে মানব উন্নয়নের নানা দিক প্রসারিত করে। প্রতিষ্ঠিত হয় টেকসই উন্নয়নের ধারা। বিশ্বজুড়ে রাষ্ট্রব্যবস্থার নানাদিক এই মৌল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

তাই রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের অনুধাবন আজকের দিনে সত্য। তিনি যা বলেছেন, তা অতীত হয়ে যায়নি। তাঁর জ্ঞান ও চিন্তার ধারাবাহিকতা বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নকে শক্তি জোগাবে। তিনি নারীকে জেগে উঠতে বলেছেন আপন শক্তিতে। আর নারী-পুরুষের সমন্বিত জীবনচর্চাকেই কাঙ্ক্ষিত জীবন বলেছেন।

ছয়.

১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া মৃত্যুবরণ করেন। ২৫ ডিসেম্বর কলকাতার এলবার্ট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন প্রাবন্ধিক সৈয়দ এমদাদ আলী। তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন: 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল আজও দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু মিসেস্ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন আর নাই। যে-নারী অবলীলায় সকলের আক্রোশ সহ্য করিয়া, সমাজের নানা মলিনতার কথা, নারীর নানা দুঃখের কথা তীব্র ভাষায় প্রকাশ করিবার সাহস রাখিতেন, তিনি আর নাই। ...তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অপরিসীম ছিল, কারণ তিনি একটা মহৎ উদ্দেশ্যের প্রেরণা লইয়া কাজ করিতেন; সে কাজের ভিতরে আমরা যে সুমঙ্গল নিহিত দেখিতাম তাহার ফলেই তাঁহার দেওয়া আঘাত আমাদের তখনকার ক্ষুদ্র সাহিত্যিক সংঘের প্রত্যেকের মনে ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠিত। মৃত্যু আজ তাঁহাকে অমর করিয়া দিয়াছে। তাঁহার স্মৃতির উপরে আজ বাংলার মুসলমান সমাজ যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছেন, বাংলার কোনো মুসলমান পুরুষের মৃত্যুতে সেরূপ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। ইহা শুধু যুগ লক্ষণ নহে, ইহা আমাদের জাগরণের লক্ষণ।'

একই সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন প্রাবন্ধিক ঔপন্যাসিক কাজী আবদুল ওদুদ। তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন : 'মিসেস্ আর. এস. হোসেনের প্রতিভা একালের ভগ্নহৃদয় মুসলমানের জন্য যেন এক দৈব আশ্বাস। নিবাত নিষ্কম্প মুসলমান অন্তঃপুরে যদি এহেন বুদ্ধির দীপ্তি, মার্জিত রুচি, আত্মনির্ভরতা ও লিপি কুশলতার জন্ম হয়, তবে আজো ভয় কেন বাংলার মুসলমানের ঘোচে না? তবে আজো কেন নিজেকে পরিবেষ্টনের সন্তান ও জগতের অধিবাসী বলে পরিচিত করবার সাহস তার হয় না?'

রোকেয়ার জীবন পরিধি ছিল ৫২ বছরের– ১৮৮০ থেকে ১৯৩২। এই সময় ছিল বাংলার রাজনীতি-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের এক উত্তাল সময়। বঙ্গভঙ্গ, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের বহুমুখী রচনার প্রকাশ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইত্যাদির পাশাপাশি তিনি নিজের অবস্থানকে তৈরি করেছেন এই সময়ের প্রাজ্ঞ মনীষী হিসেবে।

সমকালীন বাঙালি মুসলিম মনীষীরা তাঁর মূল্যায়ন করেছেন নির্দ্বিধায়। সমকালের মূল্যায়ন বিস্তৃত হয়েছে আগামী দিনের মানুষের কাছে। তাঁরা বলেছেন, মৃত্যু তাঁকে অমর করেছে। রোকেয়া একক সত্তা থেকে আজ বহু কণ্ঠস্বর। তিনি নারীর অবস্থানকে প্রকাশ করেছেন– দেখিয়েছেন পারসনাল ইজ পলিটিক্যাল। অন্যদিকে বাঙালির সামগ্রিক উন্নয়নকে দেখেছেন নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। আজকে এই ধারাবাহিকতায় স্মরণ করি একজন অসাধারণ প্রজ্ঞার মানুষ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে একজন সাহসী নারী। দুর্বার সাহসে ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নে দিয়েছিলেন দূরদর্শী চিন্তার বার্তা। ব্যক্তিজীবন থেকে রাজনৈতিক জ্ঞানের জায়গায় তিনি জেন্ডার সমতার বলয় তৈরি করেছিলেন স্বামী শেখ মুজিবুর রহমানের পাশে দাঁড়িয়ে। দুজনের পরিশীলিত জীবনের নানা সূত্রে কোথাও পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের জায়গা তৈরি হয়নি। এখন স্বাধীন বাংলাদেশ নারীদের পূর্ণতার অনেক জায়গা তৈরি করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি সংগঠনে নারীদের সুযোগ অর্জিত হয়েছে। এভাবে নারীরা বেগম রোকেয়ার স্বপ্নের জায়গা তৈরি করেছেন। তিনি এখন নারীদের মাথার ওপরে আদর্শ চেতনার মানুষ।

লেখক : বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক

তোমার ইস্কুল

কামাল চৌধুরী

১
কুপি হাতে দাঁড়িয়েছে ভোর
তোমার ইস্কুল দেখি আলোর সমান
অন্ধকার পার হতে হতে
নৌকার মাথায় আজো পালতোলা মাস্তুলের
গানে
খুঁজে ফিরি চাঁদ
অচেনা প্রান্তর থেকে দূরের আকাশ দেখে
নক্ষত্রের গল্প বলি
বলি, ঐ যে অগ্নিশিখা, আঁধারবিনাশী
এখনো অম্লান রোদ, স্বপ্ন জাগানিয়া।

২
তোমার স্বপ্নে সমতার ভোর
বালকবেলায় এক বেঞ্চিতে মেয়েটি আমার পাশে
ঘণ্টা বাজছে-স্মৃতি পাঠশালা, আহা!
অযুত নিযুত গল্পরাজ্য-পুরোনো কথারা
বারবার ফিরে আসে

এই স্মৃতিকথা আমার। তোমার নয়।
গৃহের আড়ালে বঞ্চিত বোন, তবু তুমি পাঠশালা
এখন সেখানে পাখির আকাশ
নিচে কোটি ভাইবোন
দাঁড়িয়ে রয়েছে আলো অভিসারে-সাহসে ও সংগ্রামে
হারবে না তারা, স্বপ্ন তাদের পৃথিবী করবে জয়।

লেখক : প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব
একুশে পদক ও বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি।

শীতের বাগান হবে

হাসান কল্লোল

বিষণ্ন হেমন্ত শেষে ছাদের দেয়ালে তুমি
হেলান দিয়ে আছ যেন আমন-কন্যা!
তোমার পুষ্ট সোনালি স্বপ্নের বীজে সন্ধ্যা নামে
সবুজ বীজপত্রে দুলে ওঠে মায়াময় শুভ্র আঁচল।

সেখানে অবগুণ্ঠিত নারীদের জন্য কতটুকু ভালোবাসা ছিল
লেকের থিরিথিরি জল তা জানে–
রাতের ট্রেনের বগিতে ম্রিয়মাণ আলোয় কে যায়
ঐ দূরে পাহাড়ের চূড়ায়?
কে যায় সাদা জ্যোৎস্না ঢেলে রোকেয়া সাখাওয়াতের মতো।

আমি তো অবোধ এক ঘোরলাগা
আকাশের ভোকাট্টা ঘুড়ি
উড়ি শূন্যে, উড়ি স্বপ্নে, উড়ি খসড়া মহাযানে!
মানুষ চাঁদে গেছে; আমি পড়ে আছি
শৈশবের কাদামাটি দিয়ে বানানো আমার
সেই ভাস্কর্যের প্রেমে ও অপ্রেমে!!

পড়ন্ত শীতে বাগান বানিয়ে দেখি
প্রাণভরা ফুল ফল ফোটে না সেখানে-
পরের জীবন আমি সাজিয়ে নেব তাঁর মতন
পরাব দেখো অজস্র স্বাধীন ফুলের পোশাক
আমার শীতের বাগান হবে তিন নদীর মোহনার
মতো প্রমত্ত, বিশাল।

লেখক : কবি ও আবৃত্তিকার
সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

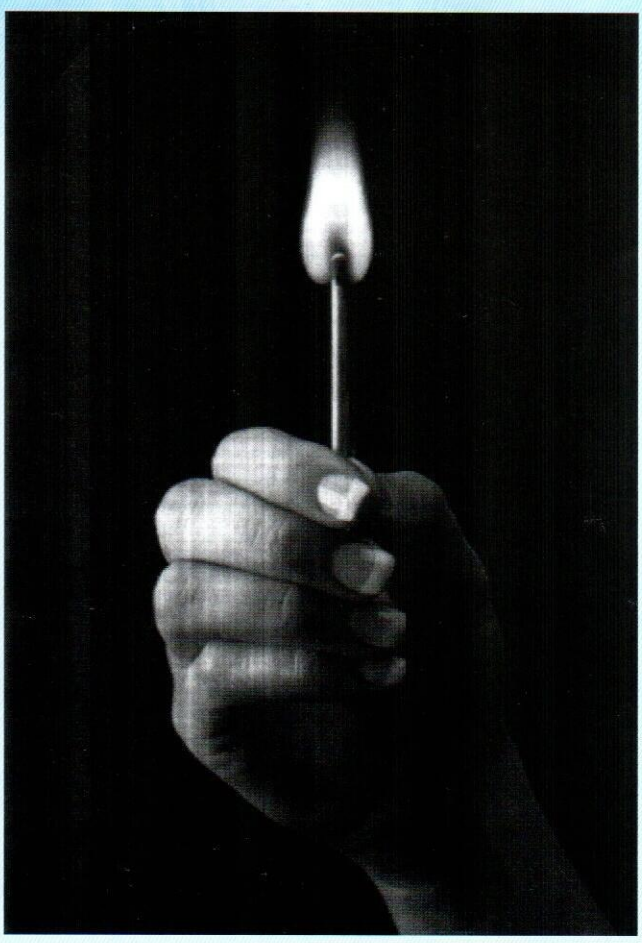

আপন আলোয় উদ্ভাসিত- বেগম রোকেয়া

লাকী ইনাম

বাংলার অবহেলিত নিগৃহীত নারীসমাজকে মুক্তির সত্য–সুন্দর পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে ত্যাগের যে উজ্জ্বল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন, তিনি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। চিন্তা, চেতনা এবং মননে তিনি ছিলেন এক অসাধারণ প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব, নারীসমাজের অন্তহীন প্রেরণার উৎস। তিনি অনুভব করেছিলেন-

'স্বর্ণ-রৌপ্য অলঙ্কারের যক্ষপুরীতে নারী
করিল তোমায় বন্দিনী, বলো কোন সে অত্যাচারী?
... ...
ভেঙে যমপুরী নাগিনীর মতো আয় মা পাতাল ফুঁড়ি!
আঁধারে তোমায় পথ দেখাবে মা তোমারি ভগ্ন চুড়ি।'

বেগম রোকেয়ার আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আজকের দিনের নারীসমাজকে সাহস ও মানসিক চেতনায় উজ্জীবিত করে।

তিনি চেয়েছিলেন বাহুবলে নয় মেধা ও সৃজনশীল শক্তি দিয়ে কীভাবে সমাজ ও জাতির অভূতপূর্ব কল্যাণ সাধন করা যায়। নারীকে তিনি সেই কল্যাণ সাধনের কাজেই নিয়োজিত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন।

নারীর প্রতি অবমাননা, অমর্যাদা, সকল প্রকার বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ছিল সাহসী প্রতিবাদ।

নারীকে তিনি শিক্ষার আলোতে আলোকিত করে, মেধা ও সৃজনশীল শক্তিতে গড়ে তোলার সংগ্রামে আজীবন কাজ করে গেছেন। গৃহবন্দি নারীর আত্মার ক্রন্দন তিনি যেন নিয়ত শুনতে পেতেন। নারীর ক্ষমতার প্রতি ছিল তাঁর অসীম বিশ্বাস।

বেগম রোকেয়া মনে করতেন নারী-পুরুষে বৈষম্য, নারী নির্যাতন কিংবা নারী নিপীড়ন শুধু সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে বাধা নয়– এক্ষেত্রে নারীদের অশিক্ষা, কুসংস্কার ও অসচেতনতাই দায়ী। তিনি তাই নারীর শিক্ষা গ্রহণকেই সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি এক জায়গায় বলেছেন, 'পুরুষগণ আমাদিগকে সুশিক্ষা হইতে পশ্চাৎপদ রাখিয়াছেন বলিয়াই আমরা অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছি।'

তিনি আসলে চেয়েছিলেন পুরুষের মতো নারীরাও শিক্ষিত হয়ে সমাজ গঠনে অংশগ্রহণ করবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তাঁর লেখনী সর্বদা ক্ষুরধার ছিল। তিনি বলেছেন, 'শিক্ষা স্ত্রীলোক-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বদা বাঞ্ছনীয়। স্থল বিশেষে অগ্নিগৃহ দাহ করে বলিয়া কি কোনো গৃহস্থ অগ্নিবর্জন করিতে পারে?'

বেগম রোকেয়া বিশ্বাস করতেন নারীর মস্তিষ্ক পুরুষ অপেক্ষা ক্ষিপ্রগামী। ফলে নারী কোনো বিষয়ে খুব দ্রুত চিন্তা করে পুরুষের অনেক আগেই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়। তবে তিনি স্বীকার করেছেন হয়তো কিছুটা শারীরিক দুর্বলতাবশত পুরুষের সাহায্যের ওপর নারীকে অনেক সময় নির্ভর করতে হয় কিন্তু তাই বলে পুরুষ প্রভু হতে পারে না।

'অলংকার দাসত্বের নিদর্শন বই আর কিছু নয়'– নারীর এই দাসত্বের স্খলনের জন্য তিনি প্রস্তাব করেছিলেন– 'অলংকারের টাকা দ্বারা জেনানা স্কুলের আয়োজন করা হউক।' স্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থা যথাযোগ্যভাবে হলেই নারীর উন্নতি অনিবার্য হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'আমরা

পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা ও অনুশীলনের সম্যক সুবিধা না পাওয়ায় পশ্চাতে পড়িয়া আছি। পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা যাহা করিতে হয় তাহাই করি।' তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শিক্ষার বিমল-জ্যোতিতে কুসংস্কাররূপ অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যাবে।

নারীর শিক্ষার্জনের পাশাপাশি তাঁর স্বপ্ন ছিল নারীর অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নারীর স্বাবলম্বী হয়ে ওঠাকে তিনি মুক্তির অন্যতম উপায় হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

তিনি নিয়ত আরো একটি বিষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন, তা হলো ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধকুসংস্কার। তিনি চেয়েছিলেন এসবের বেড়াজাল ভেঙে নারী যেন তার শ্রমশক্তিকে নিয়োজিত করে দেশ, সমাজ ও পরিবারের উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি নিজেকে যোগ্যতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

তিনি রচনা করেছিলেন এক অসাধারণ সাহিত্যকর্ম 'সুলতানার স্বপ্ন'। তবে নারী রাজ্য প্রতিষ্ঠা অবশ্যই বেগম রোকেয়ার আদর্শ বা সংগ্রাম ছিল না। তিনি কখনো পুরুষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা বলেননি। তিনি চেয়েছিলেন নারীর প্রতি পুরুষের মানসিকতার পরিবর্তন।

বেগম রোকেয়া সুলতানা হয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন এক উন্নত পুণ্য স্থানের, যেখানে নারীরাই যোগ্যতার সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন। তিনি আসলে চেয়েছিলেন পুরুষের পাশাপাশি নারীরও মেধার বিকাশ ঘটুক। নারী যেন সমান তালে, সমান যোগ্যতায় দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। তাঁর স্বপ্ন ছিল এক মুক্তচিন্তার দেশ। শিক্ষা, কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মানবতায় ও সভ্যতায় উন্নত এক অনন্য দেশ।

আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অসাধারণ মেধা ও চিন্তায় এবং দূরদর্শিতায় অনুভব করতে পেরেছিলেন দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারীসমাজকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তিনি ১৯৭২ সালের সংবিধানের ২৭ ও ২৮ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

বেগম রোকেয়ার স্বপ্নপূরণের সফল রূপকার বঙ্গবন্ধুকন্যা মানবতার জননী জননেত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়বার শপথে বলীয়ান হয়ে ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ বাস্তবায়নে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে তাঁর সরকার নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নারীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উন্নয়ন, সমঅধিকার, স্থানীয় সরকার থেকে শুরু করে সরকারের উচ্চপর্যায়ে নারী যাতে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখার সুযোগ পায় সেই কর্মযজ্ঞ চলমান রয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের এই অভূতপূর্ব উদ্যোগের স্বীকৃতি আজ বিশ্বজুড়ে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে বিশ্বের রোল মডেল।

নারীজাগরণে বেগম রোকেয়ার অবদানকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে এবং এ দেশের নারীদের সর্বক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় পদক হিসেবে 'বেগম রোকেয়া পদক' প্রবর্তন করেছে সরকার। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাঁরা আপন আলোয় আলোকিত করেছেন এ দেশের নারীসমাজকে, অন্তহীন প্রেরণা দিয়ে চলেছেন নারীদের অগ্রগতিতে– প্রতিবছর তাঁদের মধ্য থেকে নির্বাচিত পাঁচজন নারীকে প্রদান করা হয় 'বেগম রোকেয়া পদক'। এ বছরও নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখার জন্য যাঁরা এ পদকে ভূষিত হয়েছেন, তাঁদের অভিনন্দন।

আজ গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করি কবির সেই কবিতা-

'আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা।'

বেগম রোকেয়ার জন্মদিনে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি।

লেখক : চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

একাকী পথ চলার সাহসী পথিক

আনোয়ারা সৈয়দ হক

হ্যাঁ, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কথা বলছি। তিনি ছাড়া আর কার কথা আমি আজ বলব? আজ তাঁকে আমাদের স্মরণ করবার দিন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই মহীয়সীর জন্ম হয়েছিল, মনে হয় প্রকৃত সময়ের বহু আগে। যখন নারী ছিল চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি। সাবালক হওয়ার আগেই যে কন্যা-শিশুদের বিয়ে দেওয়া হতো। সেসব দিনে সাবালক এবং অবিবাহিতা মেয়ের অভিভাবকের বাড়িতে মুসলিম সমাজ পানি খেতে অনীহা প্রকাশ করত, তাদের মুসলমানিত্ব চলে যাবে বলে। সেই যুগে, সেই ক্ষণে বেগম রোকেয়ার জন্ম হয়েছিল।

বাঙালি মুসলমান নারী ছিল তখন শতাব্দীর গহিন অন্ধকারে নিমজ্জিত। গবাদি পশুর মতো ছিল তাদের দড়িবাঁধা জীবন। তারা দলে দলে জন্ম নিত, আর মৃত্যুর প্রকৃত সময় হওয়ার বহু আগেই তারা মৃত্যুবরণ করত। মানুষ হয়ে জন্ম নেওয়ার যে অসীম গৌরব তা তাদের উপলব্ধি হওয়ার আগেই তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত এবং তাদের স্বামীরা আবার বিয়ে করত।

এই মহীয়সী নারী-প্রতিভা জন্ম নিয়েছিলেন রংপুরের পায়রাবন্দে। ছেলেবেলা কেটেছিল তাঁর সেখানেই। জন্মের পর থেকেই তাঁকে পর্দা করা শেখানো হয়েছিল। পরপুরুষের সামনে তো বটেই পরনারীর সামনেও তাঁর চেহারা দেখানো ছিল নিষিদ্ধ। রোকেয়ার ছেলেবেলার স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে, বাড়িতে যদি কোনো অচেনা নারী কোনো কারণে প্রবেশ করতেন তো বাড়িজুড়ে হুলুস্থুল পড়ে যেত বাড়ির নারীরা কে কোথায় লুকোবেন সেই অস্থিরতায়। এমন অবস্থা যে, চোর প্রবেশ করলেও নিশ্চিন্ত মনে সে চুরি করে নিয়ে যেতে পারত, কারণ নারীরা সকলে পর্দার আড়ালে বা খাটের নিচে এবং বাড়ির পুরুষেরা বাইরে কাজে।

পর্দার এমন মহিমা ছিল যে চোর চুরি করতে এলেও তাকে বাধা দেওয়া যেত না আবরু হারাবার ভয়ে। শুধু আবরু নয়, ধর্মও

এর সঙ্গে জড়িত ছিল। কারণ, তখনকার দিনে যে যত বেশি পর্দা করতে পারবে, সে তত বেশি ধার্মিক। এসবই শুধু ছিল মেয়েদের প্রতি প্রযোজ্য।

পালকি চড়ে কোনো মহিলা যদি আত্মীয়বাড়ি বেড়াতে যেতেন, আর পালকিওয়ালা যদি খেয়াল না করতেন যে মহিলা পালকি থেকে নামেননি, কারণ পালকিওয়ালারও সাধ্য ছিল না যে মহিলাদের ওঠানামা লক্ষ করেন, তাহলে ভুলক্রমে সেই পালকি যখন খালি করা হয়েছে মনে করে রাস্তায় রেখে পালকিওয়ালা বিশ্রাম নিতেন, তখন সেই হতভাগ্য মহিলাও তার শিশুসমেত পালকিতে আটকা পড়ে থাকতেন। মুখ ফুটে শব্দ পর্যন্ত করতে পারতেন না, পাছে বেগানা পুরুষ তার কণ্ঠস্বর কানে শুনে ফেলে। পালকিওয়ালাকে বলতে সাহস পেতেন না যে, তিনি আত্মীয়বাড়ির দরজার সামনে পালকি থেকে নামতে পারেননি। সুতরাং, দুধের ছোট বাচ্চাকে নিয়ে তিনি পালকিতেই বসে থাকতেন। শিশুটি গরমে চিৎকার করে উঠলে শিশুর মুখ চেপে ধরে থাকতেন। ক্ষুধায়, অনাহারে, লজ্জা ও আশঙ্কায় তিলতিল করে তার সময় কাটত। সেইসব পরিবার এবং সেইসব শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশ থেকে মহান এবং সাহসী বেগম রোকেয়ার উত্থান। ভাবলে এখনো মন শিহরিত হয়ে ওঠে। আশঙ্কায় জর্জরিত হয়ে ওঠে মন।

জ্ঞানের প্রদীপ হাতে নিয়ে বেগম রোকেয়ার জন্ম হয়েছিল বলে তিনি ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন মুক্তবুদ্ধির অধিকারী একজন বালিকা। ছেলেবেলা থেকেই বায়না ধরেছিলেন লেখাপড়া শিখবেন বলে। তাও আবার বাংলা শিখবেন বলে। তখনকার দিনে অভিজাত মুসলিম ঘরের মেয়েরা বাড়িতে বসে আরবি বা ফারসি পড়লেও বাংলা বা ইংরেজি পড়া ছিল নিষিদ্ধ। বেগম রোকেয়ার বড় ভাই আসাদ সাবের ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন উদারমনা মানুষ। লেখাপড়ায় বোনের অতি আগ্রহ দেখে রাতের অন্ধকারে বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে গেলে ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে বোনকে তিনি বাংলা অক্ষর পরিচয় শেখাতেন এবং তারপর আরো পড়াশোনা করতেন– পরবর্তীকালে বেগম রোকেয়ার যখন বিহারের ভাগলপুরের অধিবাসী খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে বিয়ে হয়, তখন তিনি উদারমনা স্বামীর কাছ থেকেও সহযোগিতা পেলেন। স্বামী তাঁর জ্ঞানপিপাসা ও বুদ্ধিমত্তা দেখে তাঁকে উৎসাহিত করলেন সাহিত্য রচনায়। স্বামীর জীবদ্দশায় তিনি সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। সেটা ছিল ১৯০২ সাল। 'নবপ্রভা' নামের পত্রিকায় তাঁর প্রথম রচনা 'পিপাসা' প্রকাশিত হয়। তারপর 'মতিচূর' প্রথম খণ্ড এবং 'সুলতানার স্বপ্ন' প্রকাশিত হয়।

স্বামী সাখাওয়াত হোসেন যখন ১৯০৯ সালের ৩ মে পরলোক গমন করেন, তখন স্বামীর স্মৃতি ধরে রাখার জন্য তিনি সেই বছরেই ১ অক্টোবর ভাগলপুরে মাত্র ৫জন মুসলিম ছাত্রী নিয়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলের মেয়েরা তখন এতই অবলা ও অবোধ যে তাঁকে শিক্ষক সম্বোধন না করে 'স্কুল কি ফুপ্পি' নামে ডাকত।

তার কিছুদিন পরে তিনি যখন কলকাতায় এই স্কুলটি পুনঃস্থাপন করেন, তখন চরম কষ্ট ও অবহেলা সহ্য করে তাঁকে ছাত্রী জোগাড় করতে হয়েছিল। ঘোড়ার গাড়ি করে যখন মেয়েরা স্কুলে যেত, তাদের গাড়িটিকে সর্বাঙ্গে পর্দা দিয়ে ঢেকে, দরজা ও জানালাগুলো বন্ধ করে তবে কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চলত। কোনো বাচ্চা মেয়ে যদি কখনো কৌতূহলী হয়ে দরজা ফাঁক করে রাস্তা দেখত তো শহরময় খবর রটে যেত যে, মুসলিম পরিবারের মেয়েদের সম্মান ধুলায় লুণ্ঠিত হতে চলেছে! কারণ মেয়েরা রাস্তায় চলার সময় বেপর্দা হয়ে জানালা ফাঁক করে রাস্তা দেখে! ফলে অনেক অভিভাবক বেগম রোকেয়ার স্কুলে তাঁদের মেয়েসন্তানদের পাঠাতে চাইতেন না। তারপরও মেয়েরা যদি এভাবে পর্দাঘেরা অবস্থায় স্কুলে যেত তো শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, গরমে হিটস্ট্রোক হয়ে অনেক মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ত।

নারীশিশুর এইরকম অবমাননাকর জীবনযাপন থেকে উদ্ধারের জন্য অসীম সাহসে ভর করে এগিয়ে এসেছিলেন মহীয়সী বেগম রোকেয়া। নিপীড়িত নারীর কান্না তাঁর কানে পৌঁছেছিল বলেই তিনি সমাজের কারো নিন্দা, কারো কটূক্তির কথা কানে তোলেননি এবং গ্রাহ্যের ভেতরে আনেননি। কত বড় সাহসী হৃদয়ের মানুষ হলে এ রকম কাজ করতে পারে। কথাসাহিত্যিক হিসেবেও বেগম রোকেয়ার ছিল গভীর রসবোধ। মেয়েদের মানসভুবনটিকে তিনি হাস্যরসে, কটূক্তিতে, ব্যঙ্গে ছারখার করে ছেড়েছেন। পুরুষদের করেছেন রসালো সব কটূক্তি। একসময় তিনি তাঁর বইয়ে লিখেছেন, 'তাঁহারা (পুরুষ) যে অনুগ্রহ করিতেছেন (নারীকে), তাহাতেই আমাদের সর্বনাশ হইতেছে। আমাদিগকে তাহারা হৃদয় পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞান সূর্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ু হইতে বঞ্চিতা রাখিয়াছেন, তাহাতেই আমরা ক্রমশঃ মরিতেছি। তাহারা আরো বলেন, তাহাদের (মহিলাদের) সুখের সামগ্রী (শাড়ি, গহনা, কসমেটিকস) আমরা মাথায় বহিয়া আনিয়া দিব– আমরা থাকিতে তাহারা দুঃখ সহ্য করিবে কেন?' অর্থাৎ মহিলারা বাইরে বেরিয়ে লেখাপড়া শিখে চাকরি-বাকরি করতে যাবে কেন। এই কথার উত্তরে বেগম রোকেয়া নিজেই বলছেন, "আমরা ঐ শ্রেণির বক্তাকে তাহাদের অনুগ্রহপূর্ণ উক্তির জন্য ধন্যবাদ দিই। কিন্তু ভ্রাতঃ! পোড়া সংসারটা শুধু কেবল কবির সুখময়ী কল্পনা নহে–ইহা জটিল, কুটিল, কঠোর সংসার!"

মেয়েদের প্রতি সমাজের পুরুষদের অতিশয় রক্ষণশীল ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত সাহসী হয়ে কটাক্ষ করে বলেছেন, '(ভ্রাতঃ) বাস্তবিক অত্যধিক যত্নে অনেক বস্তু নষ্ট হয়। যে কাপড় বহু যত্নে বন্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা উইয়ের ভোগ্য হয়।'

তখন ব্রিটিশের রাজত্ব ছিল বলেই বেগম রোকেয়া বেঁচে গেছেন, তাও মাত্র তেপ্পান্ন বছর বয়স পর্যন্ত, স্বাধীন ভারত হলে কী হতো তা এখন কল্পনা করা যায়।

এসব ঘটনা ঘটেছিল মাত্রই গত শতাব্দীতে। আর আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে আমরা কী চোখে দেখছি? দেখছি যেন আমাদের চারপাশে তেলেসমাতি সব ঘটনা ঘটে চলেছে। নারী

আজ কোথায় নেই? আমাদের সমাজে নারী আজ দফায় দফায় তাদের যোগ্য স্থান অধিকার করে নিচ্ছে। পুরুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নারী আজ এগিয়ে চলেছে দেশের কাজে। ট্রেনচালক থেকে প্লেনের পাইলট হয়ে নারী তার স্থান খুঁজে নিয়েছে। পুলিশ থেকে আর্মি, আর্মি থেকে এয়ারফোর্স এবং এয়ারফোর্স থেকে নেভি– কোথায় আজ আমাদের মেয়েরা কর্মরত নেই? তারপরও কিছু কথা বলতে হয়। তারপরও আমাদের সমাজের বেশ কিছু নারীর মধ্যে যোজনব্যাপী অন্ধকার এখনো তাদের মনোজগত অধিকার করে রেখেছে। মধ্যযুগীয় সংস্কার তাদের মনকে অপসংস্কৃতি দিয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ধর্মকে একটি বিলাসী খেলনার মতো তারা ব্যবহার করতে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। আদিভৌতিকতায় নারীরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। সত্যিকারের ধর্মবোধ ও ধর্মচেতনার চেয়ে ধর্মের ভড়ংকে তারা তাদের ব্যবহার ও চালচলনে তুলে নিয়ে এসেছে। তাদের নিজেদের ভেতরে কোনো আত্মবোধ বা আত্মচেতনার স্ফুরণ ঘটছে না। প্রথাগত শিক্ষায় তারা উচ্চশিক্ষিত বটে কিন্তু জ্ঞানগত শিক্ষায় তারা গহিন অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং এর থেকে তাদের উদ্ধারের আর কোনো পথ বা উপায় যেন তারা খুঁজে পাচ্ছে না বা খোঁজার কোনো চেষ্টাও তাদের ভেতরে দেখা যাচ্ছে না।

দেখে যেন মনে হয়, তাদের বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা সবই আজ কর্দমে লিপ্ত হয়ে গেছে। তাদের ভেতরে কোনো আত্মজিজ্ঞাসার উদয় ঘটছে না, তাদের ভেতরে কোনো অভিজ্ঞান নেই। নিজের প্রতি কোনো আস্থা বা ক্ষমতার সৃষ্টি হচ্ছে না। পুঁথিগত বিদ্যা তাদের ভেতরে কোনো দিকরেখা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। এমনকি নিজকে মুক্তমনা একজন মানুষ হিসেবেও গণ্য করতে তারা অপারগ। আজ যেন তাদের সবকিছু অদৃশ্য কোনো বিকট অশুভ শক্তির কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। পর্দার অন্তরালে চলছে অনৈতিকতার ধস। অমানবতার জয়গান। তারা নিজেদের অজান্তে ছাগশিশুর মতো বলির কাঠে মাথা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এসব প্রশ্নের উত্তর এবং প্রকৃত সমাধান আজ আমাদের মেয়েদেরই খুঁজে বের করতে হবে।

আমাদের এখন বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে, বিংশ শতাব্দীতে বেগম রোকেয়া ভারতবর্ষের মুসলিম নারীদের জাগরণের জন্য যে ডাক দিয়েছিলেন, তাঁর লেখনীর ভেতর দিয়ে নারীর মানুষ-হৃদয়ে সচেতনতা এবং আলোড়ন সৃষ্টি করার মানসে যেসব বাণী প্রচার করেছিলেন, আমরা মুসলিম নারীরা তার কতটুকু অনুধাবন করতে পেরেছি? কতটুকু নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করতে পেরেছি? নারীরূপে তিনি যে আদতেই ছিলেন আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আমরা কি সেটা আজও অনুধাবন করতে পেরেছি? তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন করতে পেরেছি? আমার মনে হয়, না। মুক্তবুদ্ধির এই চিন্তককে তখনকার দিনের মুসলিমসমাজ ঘৃণার চোখে দেখেছে। তাঁকে ভয় পেয়েছে। ইসলাম ধর্মের বরখেলাপ হচ্ছে বলে তাঁকে দোষারোপ করেছে। এমনকি তাঁর এতসব মৃত্যুঞ্জয়ী কার্যকলাপের পরেও তাঁকে সমাজে প্রকৃত সম্মান দেয়নি। তিনি জীবনে কোনো দিন ধর্মের অনুশাসন অবমাননা করেননি। রোজা, নামাজ, জাকাত সব ঠিকমতো পালন করেছেন। তবুও মৃত্যুর পর তাঁর কবরও কলকাতার মুসলিমদের কবরখানায় হতে দেয়নি। অজানা, অচেনা একটি কবরস্থানে তাঁকে কবর দিতে হয়েছে।

এখন আমাদের দেশ স্বাধীন। আর বেগম রোকেয়া আমাদেরই দেশের সন্তান। আর কখনো বা কোনো যুগে বাংলার মাটিতে এরকম মনীষীর জন্ম হবে কি না জানি না। দিন যতই যাবে আমরা তাঁর কার্যকলাপ ও চিন্তাভাবনাকে আরও সফলভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হব। আমরা মনে করি, আমাদের সরকারের কর্তব্য বেগম রোকেয়াকে ভারতের সেই অচেনা কবরস্থান থেকে তুলে এনে স্বমহিমায় নিজের জন্মস্থান পায়রাবন্দে কবর দেওয়া এবং ত্রিকালদর্শী এই মহাত্মাকে প্রকৃত সম্মানের আসনে ভূষিত করা।

লেখক : মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, অধ্যাপক ও কথাসাহিত্যিক

জাগো বঙ্গবাসী

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

বেগম রোকেয়া কর্তৃক ১৩২৫ বঙ্গাব্দে রচিত কবিতার পঙ্‌ক্তি 'জাগো বঙ্গবাসী' শিরোনামের মাধ্যমে রোকেয়া দিবসে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

বেগম রোকেয়ার জন্ম এক অতি রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে। পুরোনাম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। পারিবারিক সেই পরিবেশে বড় হতে হতে রোকেয়া নিবিড়ভাবে রক্ষণশীল সমাজ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তখনই তিনি নারীজাগরণের কথা ভেবেছেন। নারীজাগরণ বলতে নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে নারীসমাজকে আলোর পথে নিয়ে আসা।

রোকেয়া অনুভব করেছিলেন, সমাজে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে নারীরা এগোতে পারবে না। পিছিয়ে থাকা সমাজের প্রতি দায়বোধ থেকে তাঁর মনে সমাজ-সংস্কারের প্রেরণা আসে। রোকেয়ার পিতা জহিরউদ্দীন আবু আলী সাবের ছিলেন বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী। কিন্তু তিনিও নারী শিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন বেশ রক্ষণশীল। বিদ্যোৎসাহী বেগম রোকেয়াকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারেনি। এ ব্যাপারে রোকেয়া সহায়তা পেয়েছিলেন বড় দুই ভাই ও বোনের কাছে। তাঁরা রোকেয়ার শিক্ষার আগ্রহকে ভালো চোখে দেখেছেন। কারণ, ইংরেজি শিক্ষালাভের ফলে তাঁর ভাইদের মনোজগৎ প্রভাবিত হয়েছিল। তাঁরা লেখাপড়া করেছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না পেলেও ভাইবোনদের সহায়তায় বাড়িতে তিনি পড়ালেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থ উৎসর্গ করেন বড় ভাইবোনদেরকে। এছাড়াও রোকেয়ার স্বামী সাখাওয়াত হোসেন তাঁর সমাজ-ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার পেছনে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সমাজসচেতন, কুসংস্কারমুক্ত, প্রগতিশীল চিন্তার মানুষ। পেশায় ম্যাজিস্ট্রেট।

তাঁদের বিয়ে হয় ১৮৯৭ সালে। রোকেয়ার বয়স তখন ষোলো বছর।

রোকেয়ার জীবনে স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। তাঁর সংস্পর্শে এসে রোকেয়ার জ্ঞানচর্চার সুযোগ আরো বেড়ে যায়। উদার মানসিকতাসম্পন্ন স্বামীর সহযোগিতায় রোকেয়া দেশি-বিদেশি বই পড়ার সুযোগ পান এবং ধীরে ধীরে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করে নেন। রোকেয়ার সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত হয় তখনই। কিন্তু ১৯০৯ সালে

রোকেয়ার বারো বছরের সংসার জীবন সমাপ্ত হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। দুই কন্যাসন্তানের জন্ম হলেও তারা অকালপ্রয়াত। রোকেয়া তখন পুরোপুরি সমাজসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। বিশেষ করে নারী শিক্ষার ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে ওঠেন। স্বামীর মৃত্যুর ছয় মাসের মাথায় স্বামীর প্রদত্ত অর্থে প্রথমে ১৯০৯ সালে ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু পারিবারিক কারণে ভাগলপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে হলে ১৯১১ সালে কলকাতায় নব উদ্যমে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'-এর কাজ শুরু করেন। ধীরে ধীরে তা একসময় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। সমাজের বাঁকা চোখ, বিরূপ সমালোচনা ও প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি নারী শিক্ষার আদর্শ গৃহে পরিণত করেন। এটি ছিল তাঁর চিন্তার ও চেতনার বাস্তবায়ন।

বেগম রোকেয়া রচিত 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থটি তিনি তাঁর মায়ের স্মৃতির প্রতি উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে তিনি যা লিখেছিলেন তা থেকেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি তৎকালে অবরোধে থাকা নারীদের বাস্তবতা। বেগম রোকেয়া লিখিত উৎসর্গলিপিটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

আমার স্নেহময়ী জননী অবরোধ প্রথার অত্যন্ত পক্ষপাতিনী ছিলেন। এস্থলে আমার শৈশবের একটি ঘটনা মনে পড়িল। সে সময় কলিকাতা হইতে রংপুর যাতায়াত করিবার সময় সারা ঘাঁটে ষ্টীমার যোগে নদী পার হইতে হইত। একবার আমরা কলিকাতায় আসিতে ছিলাম; আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর বয়স তখন মাত্র দুই বৎসর ছিল। সে এবং আমি আম্মাজানের সহিত পালকিতে বন্দী হইলাম। সেই পালকি ষ্টীমারের ডেকে রাখিয়া আমাদিগকে নদী পার করান হইল। তখন গ্রীষ্মকাল ছিল– বানাতের ওয়াড় ঘেরা রুদ্ধ পালকির ভিতর আমার শিশু ভগিনী 'হোয়া-হোয়া' করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। আম্মাজান প্রাণপণে তাহাকে চুপ করাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু পালকির নিকট উপবিষ্ট কোন আল্লাহর বান্দাই ক্রন্দনরতা শিশুকে পালকি হইতে বাহির করা প্রয়োজন বোধ করে নাই। ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ এই পুস্তকখানি তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিলাম। [বেগম রোকেয়া রচনাসমগ্র, মুহাম্মদ জমির হোসেন (সম্পাদনা), ২০১৯, পৃঃ ২৩০]

মানব ইতিহাসে নারীমুক্তির মহতী লক্ষ্যপূরণে বেগম রোকেয়া এভাবেই তৎকালীন সমাজের বাস্তবতার সত্য চিত্রের নির্মোহ উপস্থাপন করেছেন। নারীসমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে গিয়ে নানা কটুকথা শুনতে হয়েছে বেগম রোকেয়াকে। তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতেও পিছপা হয়নি রক্ষণশীল সমাজ। এসবের মধ্যে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে এবং সেই দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে দৃঢ় মনোবল নিয়ে এগিয়ে গেছেন লক্ষ্যে। এটা এক অতি কঠিন কাজ–প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিপক্ষে দাঁড়ানো। স্কুলের জন্য ছাত্রী জোগাড় করাও অনেক কঠিন কাজ ছিল। নারী শিক্ষার সেই অন্ধকার যুগে রোকেয়া কলকাতায় মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে অভিভাবকদের বুঝিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করেছেন। নারীদেরকে আলোর পথে আনার সুবিধার্থে কলকাতায় ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম'। এটি ছিল মুসলিম মহিলা সমিতি। এই সমিতির মাধ্যমে মহিলাদেরকে তাদের অধিকার, সমাজে তাদের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। নিজেই স্কুলের শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দিতেন। এমনও হয়েছে, কলকাতায় উপযুক্ত শিক্ষিকা না পেয়ে মাদ্রাজ, গয়া, আগ্রা প্রভৃতি স্থান থেকে শিক্ষক নিয়ে আসতেন। প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব পূরণের জন্য 'মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই স্কুলটি পরিচালনার জন্য সরকারি সাহায্য পেতে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁকে। উদ্দেশ্য মহৎ হলে কোনো কাজই শেষ পর্যন্ত আর কঠিন থাকে না। রোকেয়াও তাঁর সংকল্পে দৃঢ় ছিলেন বলে সরকারি অনুদান লাভে অবশেষে সমর্থ হয়েছিলেন। এই হলো প্রত্যয়, মহৎ চেতনা বলা যায়। নারীজাগরণের ক্ষেত্রে এসবই অসম সাহসী পদক্ষেপ। শুধু কি তাই– সমাজের কুসংস্কার, অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকাদের আলোর পথে আনতে হাতে নিয়েছিলেন কলম। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, পর্দার অন্তরালে থেকে নারীজাগরণ সম্ভব নয়, তাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে। এসব রোকেয়ার মনে তীব্র বেদনাবোধের সঞ্চার করে। নারীদের প্রতি সমাজের নানা অত্যাচার, নানা পীড়ন তাঁকে দ্রোহী করে তোলে।

বেগম রোকেয়া কৈশোরে পারিবারিক পরিবেশে নারীদের প্রতি অসম আচরণই শুধু প্রত্যক্ষই করেননি, তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যও উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। সেই পারিবারিক পরিবেশে বড় ভাইবোনদের সার্বিক সহযোগিতায় লেখাপড়ার প্রতি যেমন মনোনিবেশ করেছিলেন, তেমনি সমাজ বদলানোর জন্য তাঁর চিন্তা তুলে ধরেছিলেন নিষ্ঠার সঙ্গে, লেখনীর মাধ্যমে। লিখেছেন স্মৃতিকথা, উপন্যাস, প্রবন্ধ। সে সময় পত্রপত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। এসব পত্রিকার মধ্যে– সওগাত, মোহাম্মদী, নবপ্রভা, মহিলা, আল-এসলাম, নওরোজ, মাহেন ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, The Musalman, Indian Ladies Magazine প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রোকেয়ার সমগ্র রচনার মূল বিষয় ছিল সমাজের কুসংস্কার, অবরোধ প্রথার কুফল, নারীদের প্রতি সামাজিক অবমাননা, নারীর অধিকার ও নারীজাগরণের জন্য তাঁর চিন্তার প্রতিফলন। লিখেছেন– প্রবন্ধগ্রন্থ 'অবরোধবাসিনী', 'মতিচূর', নকশাধর্মী রচনা Sultana's Dream, উপন্যাস 'পদ্মরাগ'। এসব গ্রন্থ রচনায় রোকেয়ার জীবনস্বপ্ন প্রতিফলিত হয়েছে। 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের 'সিদ্দিকা' চরিত্রটিতে দেখা যায়, সিদ্দিকা তার বাগদত্তা স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। নিজের ভুল বুঝতে পেরে স্বামী তাকে পুনরায় গ্রহণ করতে চাইলে সিদ্দিকা তা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। সিদ্দিকা বলে, 'আমরা কি মাটির পুতুল যে পুরুষ হইয়া যখন ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিবেন, আবার যখন ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন?' এই বক্তব্যে নারীর মর্যাদাবোধকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাঁর সমগ্র রচনাইে ধর্মীয় বিধানের অপব্যবহার

এবং নারীদের মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবরুদ্ধতার কথা প্রকাশিত হয়েছে।

বাঙালি মুসলমান সমাজে নারী স্বাধীনতার পক্ষে প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বেগম রোকেয়া। সমাজে পিছিয়ে থাকা মুসলমান সমাজে নারীজাগরণের ব্যাপারে বেগম রোকেয়ার দূরদর্শী চিন্তা আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় আছি, যখন সমাজের সর্বস্তরে নারীরা সমভাবে শিক্ষায় ও কর্মে পুরুষদের পাশাপাশি থেকে জাতি গঠনে আত্মনিয়োগ করবে। আমরা এখন অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছি, যা নারীজাগরণের অগ্রদূত দ্রোহী বেগম রোকেয়ার পর্যায়ক্রমিক স্বপ্নপূরণের অংশ।

বেগম রোকেয়ার স্বপ্নোজ্জ্বল একটি প্রশ্নবোধক বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে তাঁর অমৃত স্মৃতি-ঐতিহ্যের সাথে নবীন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সক্রিয় সংযোগ সর্বদাই প্রত্যাশা করি :

To achieve equally with men we will do whatever needed to be done. If freedom be gained through earning livelihood we will do. If necessary we will become lady-clerk to lady-magistrate, lady-barrister, lady-judge-everything. Fifty years later by becoming lady Viceroy I will make every woman as 'Queen' in the country. Why won't we earn? Don't we have our hands and legs or don't we have intelligence? Where do we lack? Can't we utilize the labor that we invest in household chores, to run our own independent business? [Sultana's Dream, Sarifa Salowa Dina (ed.), 2018, P: 95]

বেগম রোকেয়ার মৃত্যুর নব্বই বছর পর আজ বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্ব নারীর ক্ষমতায়নে বঙ্গবাসীকে যেভাবে উজ্জীবিত করে চলেছে, তা আমাদের সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

আমরা আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবস অর্থাৎ ২৬শে মার্চ ১৯৭২ তারিখ সকালে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত ছাত্রীদের এক বিশেষ ক্রীড়ানুষ্ঠান উদ্বোধনকালে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমরা শুধু ধর্মের নামে মিথ্যা কথা বলিয়া আমাদের মা-বোনদের এতদিন দাসী করিয়া রাখিয়া ছিলাম। আজ স্বাধীন বাংলাদেশে, আপনারা বিশ্বাস করুন, ছেলেমেয়েরা সবাই সমান অধিকার পাইবে। দেশের সমস্ত মা-বোনদের কাছে আমার অনুরোধ যে, আজ এই বিধ্বস্ত বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজ গঠনের কাজে ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে, মা-বোনদেরও সমান তালে আগাইয়া আসিতে হইবে।" সমবেত মা-বোনদের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু জানান যে, 'ইতিহাসে কীর্তিমান পুরুষের নাম লেখা থাকে, কিন্তু মহিলাদের নাম লেখা থাকে না। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষদের মহিলাদের ভুলিয়া না যাওয়া উচিত।'

নারী-পুরুষ সমতার যে স্বপ্ন বেগম রোকেয়া দেখেছিলেন, তা আজ আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। আজ এ মহতী ব্যক্তিত্ব বেগম রোকেয়াকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

লেখক : সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
চেয়ারম্যান, পরিচালনা বোর্ড, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা।

বেগম রোকেয়ার স্মরণীয় উক্তি

"শিশু রক্ষা করতে হ'লে আগে শিশুর মা'দের রক্ষা করা দরকার।" মতিচূর (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃষ্ঠা-১৭৪।

স্বপ্ন-দিশারি বেগম রোকেয়া ও নারীসমাজ

ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ

কল্যাণময়ী বেগম রোকেয়া একজন অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। সে যুগের ধ্যানধারণার তুলনায় তাই তো তিনি অনেকটাই অগ্রগামী ছিলেন।

১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর তিনি জন্মেছিলেন রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত পায়রাবন্দ গ্রামে। সেই অচেনা-অজানা গাঁ-টি এখন সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, ঘরের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসা নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষাব্রতী বেগম রোকেয়ার কারণে।

তাঁর ছিল সংস্কারমুক্ত ও সাহসী দৃষ্টিভঙ্গি। তাই অবরোধের চার দেওয়াল সরিয়ে বাইরের আলোকময় জগতে এসে সমাজ ও সংসারের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর উপলব্ধি, আদর্শ ও স্বপ্নে অনুপ্রাণিত হয়েছেন বেশিরভাগ মানুষ। বাধা এসেছে বহু দিনের অটল-অচল নিয়মে বন্দি থাকা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষের কাছ থেকে।

রোকেয়া থমকে যাননি; তিনি জানেন, গোলাপ আহরণ করতে গেলে গোলাপ-কাঁটার আঘাত সইতেই হবে। শত বাধা-নিন্দা উপেক্ষা করে এগিয়ে গিয়ে তাই তিনি সামনের পথকে করে তুলেছেন দীপ্তিময়।

অবরোধ-কুসংস্কার-অজ্ঞানতার চিরকালীন ঘেরাটোপের মাঝে আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন নারী কখনই আবদ্ধ থাকতে পারে না। তাই শুরু হয়েছিল তাঁর পথযাত্রা।

সংসারে নারীর দৈনন্দিন জীবনের বেদনা ফুটে উঠেছে 'অবরোধবাসিনী'র পাতায় পাতায়। সমাজসচেতন কবি কামিনী রায়ের আবির্ভাব ঘটেছিল এ সময়। তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তি-

'করিতে পারি না কাজ
সদা ভয় সদা লাজ
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে
পাছে লোকে কিছু বলে।'

কাজের প্রতি কবির ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকলেও ভয়-লজ্জা-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাঁকে সংকল্প থেকে বিরত রাখে। কিন্তু মানুষের কল্যাণের জন্য রোকেয়ার অপ্রতিরোধ্য কাজের স্পৃহা, সমাজের ভ্রুকুটি-রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

কবি কামিনী রায়ের অন্য কবিতার পঙ্‌ক্তি-

'পরের কারণে মরণেও সুখ

সুখ সুখ বলি কেঁদ না আর'

কবির এই ভাবনার সাথে রোকেয়ার বিশাল কর্মযজ্ঞের বেশ কিছুটা সাযুজ্য রয়েছে। অন্যের জীবন বিভাময় করে তোলার জন্য তিনি অবিরত কাজ করে গেছেন–এটিই বেগম রোকেয়ার জীবনের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

অন্ধকার কক্ষে ছিল তাঁর বসবাস। পুরুষের সামনে যাওয়া শুধু বারণ ছিল না, অনাত্মীয় মহিলার মুখোমুখি হওয়াও তখন ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। সমাজের অনুশাসনে শৈশব থেকে অবরুদ্ধ জীবনযাপন করলেও প্রকৃতির সিংহদ্বার তাঁর কাছে ছিল উন্মুক্ত। বালিকা রুকু দেখেছেন–সূর্যের উজ্জ্বল আলো, চাঁদ ভাসা রাত, খই-এর মতো অজস্র তারা ছিটানো আকাশ। দেখেছেন তিনি, কেমন করে বৃষ্টির দানা রুক্ষ-ধূসর মাটিকে ভিজিয়ে সরস করে তোলে। পাপড়ি মেলা বর্ণালি ফুল সুবাসিত করে বাতাসকে। প্রকৃতি নিজ ঐশ্বর্যকে নিবেদন করে সবার জন্য।

রোকেয়া নিশ্চয়ই ভেবেছেন, অনিন্দ্য সুন্দর পরিবার ও সমাজ গড়তে হলে মানুষকেও দুহাত বাড়িয়ে দিতে হবে। এ ভাবনা থেকেই নিজের জীবনকে তিনি সুকর্মে নিয়োজিত করেছেন। মন-প্রাণ দিয়ে তিনি অনুভব করেছেন, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মহামূল্যবান। এ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মহীয়সী রোকেয়া অবরুদ্ধ নারীদের কল্যাণ কামনায় ব্রতী হয়ে উঠেছিলেন। প্রকৃতির নীরব শিক্ষায় নিজেকে পরিপূর্ণ করে তুলেছেন, তাই তাঁর অসীম কর্মক্ষমতার অপূর্ব চিহ্ন রেখে গেছেন নারীর চিন্তাচেতনায়।

সঠিক সময়ে নিঃসীম আঁধার থেকে বেরিয়ে এসেছেন তিনি বড় বোন করিমুন্নেসার সহায়তায়। তাঁরই সাহচর্যে বাংলা অক্ষরের সঙ্গে রোকেয়ার প্রথম শুভদৃষ্টি ঘটে। বিদ্যানুরাগী দু'ভাইয়ের সস্নেহ সহায়তায় ইংরেজি শিক্ষায় তিনি পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এভাবে তিনি স্বশিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে উঠেছেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রোকেয়া অনুধাবন করেছিলেন, শিক্ষার বিভা ছাড়া পারিবারিক ও সামাজিক গহিন আঁধার দূর করা সম্ভব নয়। এজন্য তাঁকে ঐকান্তিক আগ্রহে নিজেকে তৈরি করতে হয়েছে, পরিপূর্ণভাবে অবগাহন করেছেন তিনি শিক্ষার আলোয়।

পরিবারে ছিল উর্দু ও ফারসি ভাষার চর্চা। বাংলা ভাষার প্রতি তখন বিরূপ মনোভাবের কারণে রুকুর উদগ্র বাসনা থাকা সত্ত্বেও ভাষাটি প্রথমে তিনি আয়ত্ত করতে পারেননি। বাংলা ভাষার প্রতি তবুও তাঁর নিবিড় ভালোবাসা নিরন্তর বুকের ভিতর বয়ে গেছে ফল্গুধারা হয়ে। তাই পরিবার ও সমাজের রক্তচক্ষু ও ভ্রু-কুঞ্চনকে উপেক্ষা করে চর্চা করে গেছেন বোনের সহায়তায়। Sultana's Dream 'সুলতানার স্বপ্ন' বইটি শুধু ইংরেজিতে লিখেছেন, এছাড়া তাঁর বেশিরভাগ বই-ই লিখেছেন বাংলা ভাষায়। গভীর মমতায় এ ভাষাকে তিনি আপন করে নিয়েছেন। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় প্রীতি ও ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় মুসলিম নারী সম্মেলনে সুস্পষ্ট উচ্চারণে।

তিনি নারী-পুরুষের সমমর্যাদায় বিশ্বাসী ছিলেন। সমাজের এই দুটি অংশ একে অপরের পরিপূরক– এ সুন্দর ধারণা তিনি সেই অবরুদ্ধ দিনগুলোতেও লালন করেছেন। বলেছেন, 'শিশুর জন্য পিতা মাতা উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে– সর্বত্র আমরা যাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। আমাদের উচিত যে তাহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী, সহকর্মিনী ইত্যাদি হইয়া তাহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্মণ্য পুতুল জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্টি হই নাই, একথা নিশ্চিত।'

কথাগুলো সহজ-সরল-সঠিক ও চমৎকার। কথাগুলো বলেছিলেন অবরোধ প্রথার অচলায়তনের দেওয়াল সরিয়ে বেরিয়ে আসা বেগম রোকেয়া। তিনি ছিলেন আধুনিক চিন্তামনস্ক একজন মানুষ। কর্মমুখী জীবনপ্রবাহে গহিন আঁধার সরিয়ে নারী শিক্ষার প্রভায় দেদীপ্যমান করে তুলেছেন চারপাশ।

এর আগে তো ঘরের বাইরে আসাই ছিল ভারী নিন্দনীয় ব্যাপার, গর্হিত অপরাধ তো বটেই। তিনিই উচ্চারণ করতে পারেন প্রীতিস্নিগ্ধ হৃদয়ছোঁয়া উক্তি–

'মাতা, ভগিনী, কন্যে–আর ঘুমাইও না, কর্তব্য পথে অগ্রসর হও।'

বড় বোন করিমুন্নেসা ও বড় ভাই ইব্রাহিম সাবেরের অসীম স্নেহ মমতায় তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে। পরে বিয়ের পর স্বামীর সাহচর্য ও অকুণ্ঠ উৎসাহে শিক্ষা ও সমাজ সচেতনতায় পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেন। প্রগতিশীল ধ্যানধারণায় এগিয়ে যেতে থাকেন তিনি। অন্দরমহল থেকে নিজে শুধু পা রাখেননি বাইরের জগতে, গোটা নারী জাতিকে যুক্তিপূর্ণ সস্নেহ আহ্বান জানিয়ে বাইরের পৃথিবীতে পা রাখতে সহায়তা করেছেন। তাই প্রগতির পথে তিনিই প্রথমা।

তাঁরই শিক্ষায় ভাগ্যলিখন বলে মেয়েরা এখন আগের মতো সবকিছু মেনে নেয় না। তাদের দুচোখে এখন আগামী দিনের স্বপ্নের ঝিলিক। অন্দরমহল থেকে বের হয়ে ওরা পা রেখেছে আলোয় ডোবা বাইরের জগতে। শুধু রান্নাবান্না, সন্তান লালনপালন, স্বামীসেবা আর ঘরগেরস্থালির মাঝে ওরা এখন বন্দি নেই। নারীরা এখন শিল্পকারখানা, ইট ভাঙা, জোগালির কাজ ছাড়াও সংসারে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আনার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করছে। গৃহকর্মীরা প্রতিটি সংসারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভোর থেকেই শুরু হয় খেটে খাওয়া নারীর মিছিলের জয়যাত্রা।

মহাকালের নিখুঁত নিয়মে সময় বয়ে গেছে অনেকটা। মানুষের চিন্তাভাবনায় এসেছে অনেক পরিবর্তন। এখন আর বাল্যবিবাহ নয়, সহনশীলতা নয়, যৌতুকের জন্য অত্যাচার নয়, বহুবিবাহ নয়–এখন রুখে দাঁড়ানোর সময়। ওদের বলতে শুনেছি, মেয়েমানুষ হলে কী হবে, আমরা মানুষ তো।

বুকের ভিতর এই যে আত্মসম্মানবোধ তথা আত্মমর্যাদার জন্ম হয়েছে তাও বেগম রোকেয়ার কারণে। নতুন এ ভাবনার স্বপ্নবীজ প্রোথিত করে গেছেন তিনি। তাই তো নারীরা এখন উপলব্ধি করতে পারছে– জীবনযুদ্ধ করে অর্জন করতে হয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য।

প্রচলিত পল্লিগানে এ কথারই প্রতিফলন ঘটেছে চমৎকারভাবে–

'আমার হাত বান্ধিবি, পা বান্ধিবি
মন বান্ধিবি কেমনে'-

সব বাঁধা যায়, মনকে তো বেঁধে রাখা যায় না। মানুষের এই মনকে জাগিয়ে দেওয়ার কাজটি করেছেন বেগম রোকেয়া। চারপাশে এই যে নারীজাগরণ তা এসেছে আলোর দিশারির হাত ধরে। সঠিকভাবে বলতে গেলে তিনি শুধু নারীজাগরণের অগ্রদূত নন, সামগ্রিকভাবে সমাজের মগ্নচৈতন্যের সকল মানুষের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছেন সোনার কাঠির ছোঁয়ায়।

সংসার জীবনে কিংবা সমাজে পালাবদল তো সহজে ঘটে না। তাই এখনো অনেক পরিবারে পুত্র ও কন্যাসন্তানের মাঝে বিভাজন রয়েছে। মাছের মুড়ো, দুধের সর, মাখন, ঘি, দুধ-সংসারের উত্তরাধিকারী বলে যাদেরকে মনে করা হয়, ওদের পাতেই পড়ে এসব। সচেতনতা এলেও অল্প পরিমাণে পড়ে মেয়েদের পাতে। যথারীতি অভ্যেসের কারণেও এটি হতে পারে। এর জন্য কম দুঃখবোধ হয় না মেয়েদের। সংসারে নীরব অবমাননা এমনই এখনো ঘটে।

ইউনিসেফের মীনা কার্টুনে দেখি, মেয়ে কাজ করে, কলসি ভরে পানি আনে। ছেলে রাজু নিয়মিত স্কুলে যায়, পড়াশোনা করে। পরে অভিভাবকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। পর্দায় দেখি মীনা ও রাজু, ব্যাগ হাতে দুজনেই স্কুলে যায়, পড়াশোনা করে। টিয়ে পাখি মিঠু পাঠসঙ্গী হিসেবে মীনাকে সাহায্য করে। দর্শকরা এই সমতা দেখে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।

সচেতন মানুষরা এখনো gender equality নিয়ে কথা বলেন, সমাজের নানা বৈষম্য নিয়ে সোচ্চার হন। নারী-পুরুষের শুধু যে সমান অধিকার নিয়ে ভাবেন তা নয়, নানা অকাট্য যুক্তি দিয়ে কথা বলেন।

ভাবতে অবাক লাগে, বেগম রোকেয়া বৈষম্য ও সমতা নিয়ে অনেক আগেই চমৎকারভাবে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা সমাজের অর্ধ-অঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কি রূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কত দূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে, তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্য তাহাই।'

তাঁর স্বপ্ন আজ পরিপূর্ণভাবে সফল হওয়ার পথে। স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে হাসপাতাল, মিডিয়া জগৎ, কর্পোরেট জগৎ– প্রতিটি কাজের ক্ষেত্র এখন মেয়েদের পদচারণায় মুখর। তাদের জ্ঞান-গরিমায় গর্বোজ্জ্বল হই আমরা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের চেষ্টা চলছে। বিশেষ করে মেয়েদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথযাত্রায় তিনি সবসময় সোচ্চার।

সকালবেলা রিকশা, বাস, স্কুটি কিংবা বাইকে চড়ে মেয়েরা ছুটে চলেন কর্মক্ষেত্রে। পরনে তাদের শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, প্লাজো, জিনস্-কুর্তি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে, লাঞ্চ আওয়ারে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, স্টিফেন হকিংয়ের ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে আলোচনা থেকে শুরু করে পদ্মা সেতুতে সেলফি আপলোড করার গল্প কিছুই বাদ থাকে না তাদের।

ব্যাংকের প্রফিট-লস, ডলারের ওঠানামা পর্যবেক্ষণ করার সাথে সাথে মহিলা ব্যাংকাররা গ্রাহকের সাথে সৌজন্য বিনিময় করেন, তার সাথে হালনাগাদ তথ্যও সংগ্রহ করে নেন।

কর্মজীবী নারীদের এই অনায়াসপটুত্ব মুগ্ধ হয়ে দুচোখ ভরে দেখার মতো।

নারী কর্মীদের এই দৃশ্যমান অগ্রযাত্রা শুধু নিজ কর্মক্ষেত্রে নয়, দেশের সার্বিক উন্নয়নের জোয়ারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

এ যেন নিত্যস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব বেগম রোকেয়ার নারীস্থান। তিনি স্বপ্নদিশারি, কল্যাণময়ী।

আজকের নারীদের এগিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখা কোনোদিন শেষ হবে না, কারণ দুচোখভরা স্বপ্নের মৃত্যু নেই।

লেখক: বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক

বেগম রোকেয়ার স্মরণীয় উক্তি

"নর ও নারী উভয়ে মিলিয়া একই বস্তু হয়। তাই একটিকে ছাড়িয়া অপরটি সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না এখনও তাহাই বলি এবং আবশ্যক হইলে ঐ কথা শতবার বলিব।" *(বোরকা, পৃষ্ঠা-১৮)*

"যাহা হউক, পর্দা কিন্তু শিক্ষার পথে কাঁটা হইয়া দাঁড়ায় নাই। এখন আমাদের শিক্ষয়িত্রীর অভাব আছে। এই অভাবটি পূরণ হইলে এবং স্বতন্ত্র স্কুল কলেজ হইলে যথাবিধি পর্দা রক্ষা করিয়াও উচ্চশিক্ষা লাভ হইতে পারে।" *(বোরকা, পৃষ্ঠা-১৯)*

"আমরা উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কী নাই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকর্মে ব্যয় করি সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসা করিতে পারিব না ?"

"যে বাহু-লতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না? এখন একবার জ্ঞানচর্চা করিয়া দেখি ত এ অনুর্বর মস্তিষ্ক সুতীক্ষ্ণ হয় কি না।" *(স্ত্রীজাতির অবনতি, পৃষ্ঠা-১১)*

নারী জাতির অহংকার- বেগম রোকেয়া

বেগম চেমন আরা তৈয়ব

বেগম রোকেয়া একজন শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক বিদূষী নারী। বাংলা ও বাঙালি নারীকূলের অহংকার হিসেবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আবর্তমানকাল চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি ১৮৮০ সালে রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের তৎকালীন সমাজব্যবস্থা ছিল পুরুষতান্ত্রিকতার দখলে, নারীরা ছিল অনেকটা গৃহবাসিনী। জাতি-ধর্ম-দেশ-কালভেদে কোথাও নারীকে শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছনে রাখার কথা বলা নেই; বরং আমাদের ধর্মমতে জ্ঞান অর্জন বাধ্যতামূলক, যা পবিত্র কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত আছে। তৎকালীন মুসলিম সমাজব্যবস্থায় নারীজাতির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা থাকার ফলে তিনি তাঁর ভাই-বোনের কাছে বাংলা, ইংরেজি, আরবি ও উর্দু শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৯৬ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মুক্তমনা স্বামী তাঁর স্ত্রীর জ্ঞান-পিপাসু মন মানসিকতা বুঝে সার্বিক সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করেন। তাঁর স্বামীর সানুগ্রহ পৃষ্ঠপোষকতার ফল তাঁর রচিত প্রথম বাংলা গল্প 'পিপাসা' প্রকাশিত হয় ১৯০২ সালে।

বেগম রোকেয়া রক্ষণশীল সমাজের পর্দা প্রথার কোনো বিরোধীতা না করে নারীর শিক্ষা তথা নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা ভেবে নারীজাগরণের অগ্রদূত হিসেবে আর্বিভূত হয়েছিলেন। তিনি সারাজীবন কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে একজন খাঁটি বাঙালি মুসলিম নারী ছিলেন।

১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'মতিচূর'। এ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'যে শকটের এক চক্র বড় (পতি) এবং এক চক্র ছোট (পত্নী) হয় সেই শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না; সে কেবল একই স্থানে (গৃহকোণেই) ঘুরিতে থাকিবে। তাই ভারতবাসী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।' পুরুষ ও নারী একই বৃন্দে দুটি ফুল। দুটি ফুলের সমানভাবে যত্ন নেওয়া দরকার। তিনি নারী শিক্ষা ও লিঙ্গ সমতার কথা বিভিন্ন জায়গায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

বেগম রোকেয়া ছিলেন এক অনন্য সাধারণ নারী, যাঁর লেখনীর কারণে তৎকালীন ভারতবর্ষের নারীরা শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে গিয়েছেন। ১৯০৯ সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর মাত্র ৮জন ছাত্রী নিয়ে ১৯১১ সালে ভাগলপুরে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩১ সালে ঐ স্কুল থেকে তিনজন ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হন।

১৯১৬ সালে কলকাতায় 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' নামে একটি মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। নারী মুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন বেগম রোকেয়া। বেগম রোকেয়ার আমৃত্যু নারী মুক্তির দর্শন আজও আমাদের মাঝে অনুপ্রেরণার উৎস।

বেগম রোকেয়ার যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন আমাদের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কারাবন্দিকালীন বাঙালিদের এগিয়ে নিতে নেতৃত্বের মশাল হাতে ছিলেন তিনি। একইভাবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা নারীর উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে সারা বিশ্বে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'যা কিছু পুরুষেরা উপার্জন করল তা তাদেরই অংশ; আবার নারীরা যা কিছু উপার্জন করল তাও তাদেরই অংশ,' -সূরা আন নিসা, আয়াত: ৩২

১৯৩২ সালে ৯ ডিসেম্বর বাঙালি নারীর গর্ব বেগম রোকেয়া মৃত্যুবরণ করেন। ঐতিহাসিক এই দিনে আমরা তাঁকে স্মরণ করি, শ্রদ্ধা জানাই, তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করি।

লেখক : সাবেক সংসদ সদস্য, চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শতাব্দীর শ্বেতপদ্ম

ফরিদা পারভীন

আজ ৯ ডিসেম্বর ২০২২। বাংলাদেশের নারীজাগরণের অগ্রদূত 'বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন-এর জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী। নারী শিক্ষা ও অধিকার আদায়ের অগ্রদূত এই মহীয়সী নারীর স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি।

যে-কোনো দেশের উন্নয়নকে টেকসই করতে চাই সে দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের দক্ষ পরিচালনা পদ্ধতি ও দেশের নাগরিকদের সমন্বিত উদ্যোগ ও অংশগ্রহণ। আধুনিকমনস্ক বেগম রোকেয়া এই গূঢ় সত্যটিকে বুঝতে পেরেছিলেন উনিশ শতকের গোঁড়াতেই। সমাজের ভারসাম্য রক্ষায় পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ সমানভাবে প্রয়োজন। ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার আর গোঁড়ামির প্রাচীর ভেঙে, সমাজপতিদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে এই সহজ সত্যটিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে বেগম রোকেয়ার ছিল জীবনব্যাপী সংগ্রাম।

শিক্ষার প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, কেবল শিক্ষাই দিতে পারে নারীকে পুরুষের সমমর্যাদা ও সমঅধিকার। শিক্ষার মাধ্যমেই নারী অর্জন করতে পারবে অর্থনৈতিক মুক্তি। অংশগ্রহণ করতে পারবে সমাজ পরিবর্তনে আর দেশ গড়ার মহাযজ্ঞে। বড় ভাইয়ের উৎসাহ আর স্বামীর সহযোগিতায় ইংরেজি ভাষায় যেমন দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তেমনি এই শিক্ষাকে নারীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য শত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়। তাঁর সাহিত্যে প্রকাশ পায় নারীর ভিন্ন এক রূপ। বিচক্ষণ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, সমাজসংস্কারক এক আলোকিত নারী হয়ে সমাজে বিপ্লব সৃষ্টিকারী বেগম রোকেয়া তাই আজও আমাদের অনুপ্রেরণার এক অনন্য উদাহরণ। বেগম রোকেয়ার স্বপ্নের বাস্তব উদাহরণ আজ বাংলাদেশ। এদেশের সফল রাষ্ট্রনায়ক একজন নারী, যাঁর সুদক্ষ নেতৃত্ব এদেশকে করেছে বিশ্বের কাছে সুপরিচিত। তিনি বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের দিয়েছেন একটি স্বাধীন দেশ। বঙ্গবন্ধু দিয়েছেন নারী-পুরুষের সমঅধিকার সংবলিত এক অনন্য সংবিধান। আর জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা, এদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্ব সারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে পরিচিত করেছে নারী-পুরুষের সমতার রাষ্ট্র হিসেবে। শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি, রাজনীতি, প্রশাসন, খেলাধুলা কিংবা পর্বতারোহণ– সব ক্ষেত্রেই এখন নারীদের সমান বিচরণ। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সমাদৃত হচ্ছে এদেশের নারীরা। অর্জন করেছে সম্মান ও সম্মাননা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভিশন হচ্ছে 'জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ ও সুরক্ষিত শিশু' এবং মিশন হচ্ছে 'নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাঁদের সামগ্রিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ।' 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১' প্রণয়ন করে উন্নয়নের সব স্তরে নারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে প্রণয়ন করা হয়েছে কঠোর আইন ও আইনের বাস্তবায়নে নেয়া হয়েছে কঠোর পদক্ষেপ। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নারীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানের জন্য ভিডব্লিউবি কার্যক্রম ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। একই সাথে মা ও শিশু সহায়তা তহবিল কর্মসূচির মাধ্যমে নিরাপদ মাতৃত্ব ও শিশুর সুস্থ জীবন নিশ্চিতকল্পে গৃহীত কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

উপজেলাসমূহে আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের তৃণমূলপর্যায় থেকে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা হচ্ছে। ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীদের স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি উদ্যোক্তা

হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে 'জয়িতা ফাউন্ডেশন'-এর উদ্যোগে দেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে 'জয়িতা' বিপণন কেন্দ্রসহ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের জন্য 'ই-জয়িতা' প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হয়েছে। কর্মজীবী নারীদের নিরাপদ আবাসন ও তাঁদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার ও আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারীরা এখন আরো সপ্রতিভ। তথ্যপ্রযুক্তিতে নারীর প্রবেশগম্যতার উদাহরণ হিসেবে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে পুরুষের পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তারা কাজ করছে।

প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীরা এখন ডিজিটাল বাংলাদেশের গর্বিত অংশীদার। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাঁরা নিজেদের প্রস্তুত করে যাচ্ছে। করোনা মহামারিকালীন এবং মহামারি পরবর্তী সময়ে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে অনলাইনে নারীরা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা পরিচালনা শুরু করে, যা নারীর পেশাগত মনোভাব তৈরিতে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। কর্মক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নারীর গৃহস্থালির কাজ মূল্যায়নে ইতিবাচক সামাজিক মনোভাব গড়ে উঠছে। দেশের জিডিপিতে এখন নারীর অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। 'নারী উন্নয়নের রোল মডেল' খ্যাত বাংলাদেশ তাই বিশ্বের কাছে সমাদৃত।

নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদান এবং দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে দক্ষ নেতৃত্বের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'লাইফ টাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট' অ্যাওয়ার্ড ছাড়াও 'প্লানেট ফিফটি-ফিফটি' পুরস্কার আমাদের করেছে উজ্জীবিত। দারিদ্র্য দূরীকরণ, পৃথিবীর সুরক্ষা এবং সবার জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অর্জন করেছেন 'এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার-২০২১'। ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তায় নিজেদের অর্থায়নে নির্মাণ করেছেন স্বপ্নের 'পদ্মা সেতু'। তাঁর নেতৃত্বে আগামীর পথে এগিয়ে চলেছে দেশ স্বগর্বে।

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বিশ্বের কাতারে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আজ আমরা একজন নারী রাষ্ট্রনায়কের নেতৃত্বে একসাথে কাজ করে যাচ্ছি। 'ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' আমাদের নিয়ে যাবে সমৃদ্ধির সুউচ্চ শিখরে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়ন হচ্ছে এদেশের মানসকন্যা শেখ হাসিনার হাত ধরে। এভাবেই এদেশে রোকেয়ার স্বপ্ন আজ বাস্তবরূপে ধরা দিয়েছে।

বেগম রোকেয়ার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে এদেশের নারীরা আজ যেমন সফল, সমগ্র জাতি তেমনি গর্বিত। বাংলাদেশ সরকার তাই সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী উন্নয়ন ভাবনায় অবদান রাখার জন্য সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদক হিসেবে 'বেগম রোকেয়া পদক' প্রবর্তন করেছে।

এ উপমহাদেশের নারীদের জীবনের অন্ধকারকে যিনি শিক্ষার আলো জ্বেলে উদ্ভাসিত করেছিলেন, সেই মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন-এর অবদান এদেশে চিরজাগরূক হয়ে থাকবে–আজকের দিনে এই আমার প্রত্যাশা।

লেখক : মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা

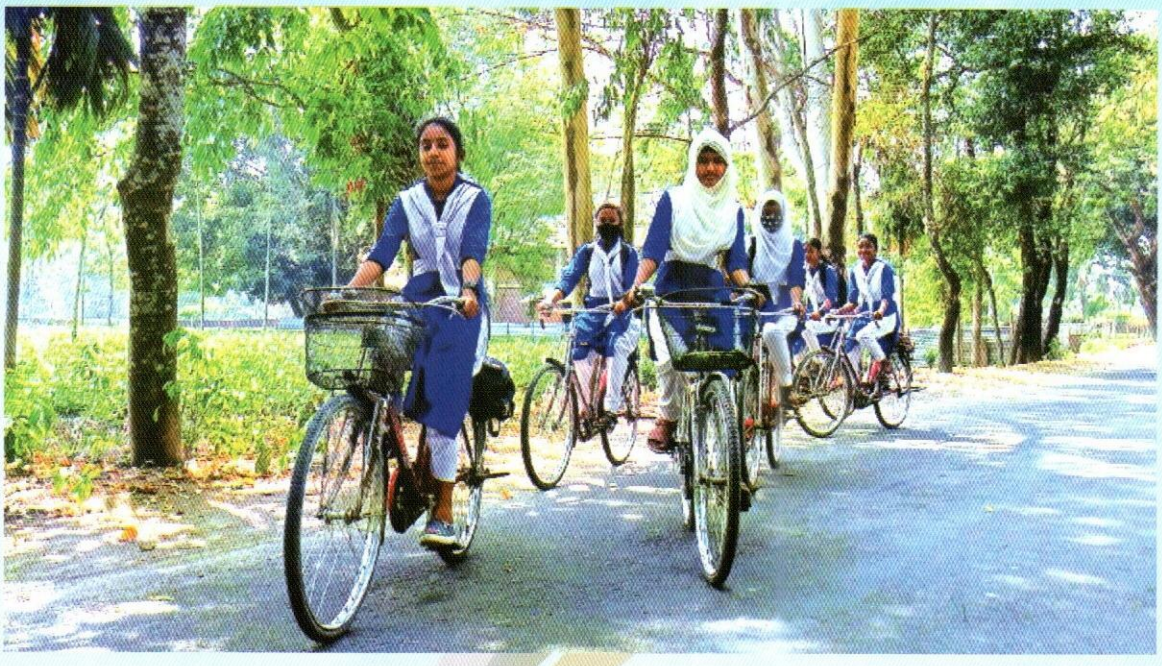

রোকেয়ার মতো নারী

ফারুক হোসেন

একজন নারী এমন বাঙালি বিশাল চিন্তাবিদ
তিনি আঁকলেন সকল বাঙালি নারীর প্রাণের ভিত।
তিনি লিখলেন গদ্য-পদ্য মুক্ত ভাষার ছক,
অন্ধকারের মধ্যে মহান সমাজসংস্কারক।

তিনি মুসলিম জাগরণে এক শক্ত অগ্রদূত,
বাঙালি নারীকে দেখালেন পথ যেই পথে নেই খুঁত।
তাঁর আগমন মিঠাপুকুরের ছোট্ট পায়রাবন্দ,
কিন্তু উদার সাগরের মতো, আকাশের মতো মন।

তাঁর কাহিনিই পদ্মরাগ আর প্রবন্ধ মতিচূর,
ছড়িয়ে দিয়েছে বাতাসে নারীর জেগে উঠবার সুর।
উর্দু আরবি ফারসি হিন্দি ইংরেজিতেও ধার,
রক্ষণশীল ঘরে এই নারী দেখালেন অধিকার।

যত গোঁড়ামির জাল ছিঁড়ে তিনি দেখালেন এক পথ,
সেই পথে আসে নারী-পুরুষের উভয়ের মতামত।
মানুষের প্রতি তাঁর ছিল এক গভীর মমতাবোধ,
ভেঙেছেন ভালোবাসার মধ্যে যত ছিল অবরোধ।

তাঁর মন্ত্রই নারীর মুক্তি নারীর শিক্ষা লাভ,
নারীরাও এক বিশাল শক্তি হিসেবে আবির্ভাব।
এই নারী সব নারীর অগ্রগতির উৎসলোক,
বেগম রোকেয়া তাঁর মতো নারী ঘরে ঘরে আজ হোক।

লেখক : সাবেক সচিব, শিশু সাহিত্যিক ও ছড়াকার

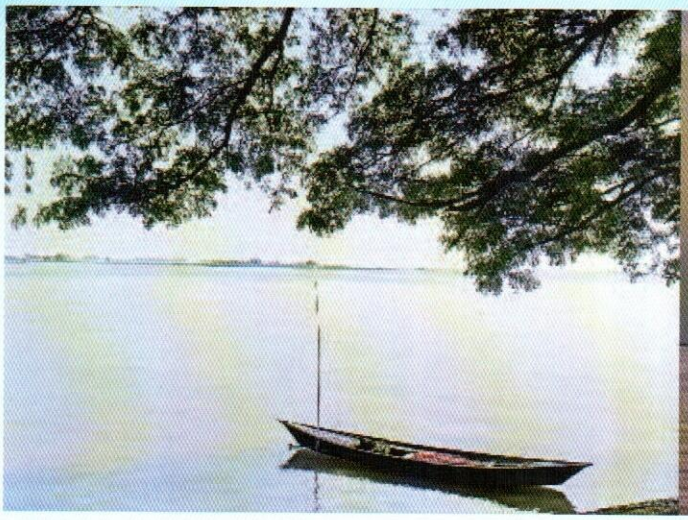

মাতৃভূমির সমস্ত মাটিকে

নির্মলেন্দু গুণ

আমার তখন হামাগুড়ি দিয়ে সারা গায়ে মাটি মেখে
ঘুরে বেড়ানোর বয়স। কিংবা বলা যায় তারো কিছু আগে,
যে সময়টাকে আমরা জীবন থেকে পৃথক করে ভাবি,
অর্থাৎ আমি ছিলাম যখন আমার মায়ের গর্ভে,
খুব নিরাপদ এবং নিঃসঙ্গ, তখন প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায়
মাটির তলার ঝিঁঝি পোকাদের গান শুনবার জন্য
অধীর আগ্রহে কান পেতে থাকতাম আমি।

ঝিঁঝি পোকারা মাটি কাঁপিয়ে দল বেঁধে সমস্বরে
গান গেয়ে উঠত, আর আমি যা শুনতে চাই, তা-ই
শুনতে পাবার ভয়ে যখন জড়িয়ে ধরতাম মাকে,
তখন থেকেই আমার মায়ের পায়ের তলায় এই
মাটিকে আমি জানি।

আগুনে পোড়া চিকর মাটি ছিল
আমার মায়ের খুব প্রিয়,
আমি ভিতর থেকে কত আনন্দেই না
গ্রহণ করতাম তাকে।
আমার মায়ের নিকানো উঠানে
আমি বারবার ছুটে যেতাম
আলপনা আঁকা পদ্ম তুলে আনতে।

গায়ে কাদা মাখিয়ে কতবার যে আমি নষ্ট করেছি
আমার নতুন কেনা মূল্যবান জামা।
কতবার যে মায়ের সতর্ক চোখ ফাঁকি দিয়ে
আমি বিছানা থেকে গড়িয়ে পড়েছি
পিতৃপুরুষের এই কোমল-কঠিন মাটির উপরে।
আমার কিচ্ছু হয়নি, শুধু আঘাতে আঘাতে
বেড়েছে আমার আঘাত সইবার শক্তি।

আজ সেসব কথা ভেবে যখন পায়ের তলায়
এই মাতৃরূপা মাটির দিকে তাকাই,
তখন বুকের ভিতর থেকে ফেলে আসা শৈশবের
হুহু করা কান্না উঠে আসে। আমি কাঁদি।
মনে হয় এক বৃদ্ধ কুমোর আমার শরীরে বসে
ছেনে চলেছেন মহাকালের মণ্ড।

অপত্য স্নেহের জোয়ারে ভেসে যেতে যেতে
আমি ফিরে তাকাই এই মাটির দিকে।
ভাবি, কত মুষলধারার বৃষ্টিতেই না ভিজেছে তার আস্তর,
কত চৈত্রের দাবদাহেই না ফেটে চৌচির হয়েছে তার দেহ,
কত যুদ্ধ, দাঙ্গা, মারী, মড়কের আঘাতই না সে সয়েছে
মুখ বুজে, কত শস্যবঞ্চনার অসহ্য প্রহরকেই না সে
প্রত্যক্ষ করেছে তার অনিচ্ছুক চোখ।

ইচ্ছে হয় আমার প্রিয় মাতৃভূমির সমস্ত মাটিকে
সমস্ত জীবন আমি আমার দু-হাতের অঞ্জলিতে ধরে রাখি:
মা যে রকম জনারণ্যে আগলে রাখেন তার দুরন্ত শিশুকে।

লেখক : বিশিষ্ট কবি

বেগম রোকেয়ার স্মরণীয় উক্তি

"গৃহে যে গৃহিণী, ধর্মে যে সহধর্মিণী, ভাবী বংশধরের যে জননী, ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার যে রক্ষয়িত্রী ও পালনকর্ত্রী তাহাকে সঙ্গে না লইলে আপনি গন্তব্য স্থানে পৌঁছাতে পারিবেন না!"

"আমরা সমাজের অর্ধাঙ্গ, আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কীরূপে?"

"পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে– একই।
তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা আমাদের লক্ষ্যও তাহাই।"

"কন্যারা জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত দেশমাতৃকার মুক্তি অসম্ভব।"

সূর্যপরশা

রাম চন্দ্র দাস

'অসূর্যম্পশ্যা'-
শব্দবন্ধ অভিধানে ছিল শুধুই নারীর জন্য
কঠোর সাধনে যে হবে সেই জন-
নারী জীবনের সফলতা নিয়ে সেই জনই হবে ধন্য।
সারাটি জীবনে সূর্য না দেখে পুণ্য করবে নারী
সমাজপতিরা পুঁথি-পাঁজি ঘেঁটে বিধান দিয়েছে তারই!

নারী স্বাধীনতা!
স্বাধীনতা হবে নারীর জন্য!! কী উদ্ভট শব্দ!!!
তার চেয়ে বরং যতটুকু পারো করো তারে শুধু জব্দ
বিদ্যা-শিক্ষা-জ্ঞানের প্রদীপ যেন না দেখে সে চোখে
কখনোই তাকে দেখতে না পায় বেগানা অন্যলোকে।

তার জন্যই রচি কারাগার দুয়ার করেছে বন্ধ
সকল আলোর প্রবেশ নিবারি দু-চোখ করেছে অন্ধ।

নানা কারবারে আনা বারবার কিম্ভূত কত বর্মের
রুদ্ধ করতে নারীর বিকাশ, কখনো দোহাই ধর্মের
কখনো রীতির, অলীক নীতির কত না তত্ত্ব এনে
এগোনোর পথে বাধার পাহাড় বারবার দেয়া টেনে
নিদান-বিধান অবিরাম দান করেন সমাজপতি
প্রতিটি বিধানে বেড়েছে নিদানে নারীদের দুর্গতি।

ধর্ম বা নীতি কোথায় কেড়েছে জননীর অধিকার?
সহজ প্রশ্নে জননী পায়নি উত্তর কোনো তার।

দিনগুলি ছিল বন্দি আঁধারে, পাষাণ প্রাচীরে, অদ্ভুত!
নারীরা ভাবতো প্রাচীর সরাতে আসবেই কোনো দূত
আসবে এ ধরণিতে
দেখিয়ে দেবে সে কল্যাণ পথ অবলা নারীর হিতে।
ছিল প্রার্থনা নিযুত প্রাণের যুগযুগান্ত ধরে
তুমি এলে সেই আলোকের পথে- নারীজাগরণ তরে।

সেই থেকে শুরু নারীর উত্থান সকল বাঁধন ছিঁড়ে
মহলবাসিনী হলো সাহসিনী ভয় ও ভীরুতা ঝেড়ে
তোমার দেখানো আলোকের পথে শুরু হলো তার যাত্রা
দিনে দিনে আজ আলো ঝলমলে, পেয়েছে নতুন মাত্রা।

আজ এই দেশে বিজয়ীর বেশে জীবনের সব অঙ্গনে
পতাকা ওড়ায় ওই ওরা সব, নন্দিত ওরা জনে জনে
যাত্রা সেদিন সূচিত যাদের তব কল্যাণী হাতে
তাদেরই বিকাশ ঘটেছে নিতুই সময়ের সাথে সাথে।

তুমি মহীয়সী রোকেয়া
অজ্ঞানতার নদী পেরোবার তুমি বেঁধেছিলে খেয়া
তুমি এনেছিলে আলোর প্রবাহ অবারিত করি দ্বার
নিঃসীম নিকষ আঁধারের কারা ভেঙে-
চির বন্দিরে তুমি দিলে করে আলোকিত উদ্ধার।

হাতে বই, সাথে আলোর প্রদীপখানি
করে দিলে তুমি সূর্যপরশা, শোনালে আশার বাণী
তোমারই আশিসে আজ এই দেশে নারী দুর্বার ধায়
জননী, জায়া ও কন্যারা মিলে বিজয়ের গান গায়
সোনাঝরা এই স্বপ্ন সফল বিকশিত বাংলায়॥

লেখক : সাবেক মহাপরিচালক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

রোকেয়ার ভাবনায় বর্তমান: পরিপ্রেক্ষিত-প্রাসঙ্গিকতায় একবিংশ শতাব্দী

ড. তানিয়া হক

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় রোকেয়ার আত্মত্যাগ, বিচক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক বিধিব্যবস্থার ওপর তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণ ও যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ, প্রজ্ঞার গভীরতা এবং প্রতিবাদী কণ্ঠের বলিষ্ঠতা প্রভৃতির বিবেচনায় তিনি ছিলেন একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব। সমাজসংস্কারক ও সাহিত্যিক হিসেবে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর কর্মক্ষমতা ও তিতিক্ষা, আদর্শের মহত্ত্ব, দৃঢ় মনোবল ও অসীম সাহসিকতা নিয়ে প্রায় একশ বছর আগে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা প্রসঙ্গে যেসব কথা বলেছেন তা বর্তমানেও গভীরভাবে উপলব্ধি করা যাচ্ছে। এদেশের নারীসমাজ তাঁরই অনুপ্রেরণায় ধীরে ধীরে অন্ধকার থেকে আলোকিত জীবনের দিকে অগ্রযাত্রা শুরু করতে সক্ষম হয়েছে। তবে বর্তমান বাংলাদেশে লিঙ্গসমতার মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আপাতদৃষ্টিতে অগ্রগামী মনে হলেও আমাদের এ যাবৎকালীন অর্জনগুলোকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বহুদূর এগিয়ে এসে বহু অর্জনের ভিড়ে এখনো নারীর প্রতি বৈষম্যের ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে একবিংশ শতাব্দীর প্রচণ্ড মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সেজন্যই নারীমুক্তির প্রশ্নে আমরা এখনো রোকেয়ার আদর্শেই সমাধান খুঁজি। কেননা একজন নারীবাদী হিসেবে রোকেয়া তাঁর সমাজে যে গভীর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হয়েছিলেন তার কোনো বিকল্প নেই।

বাঙালির ইতিহাসে যেসব মনীষীগণ সমাজ ও মানুষের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে সংস্কারকের ভূমিকায় দায়িত্বশীল নেতৃত্ব দিয়ে গিয়েছেন মহীয়সী রোকেয়া তাঁদের মধ্যে অন্যতম। যিনি ব্যক্তিত্ব ও মননে সময়ের চেয়ে বহুযুগ এগিয়ে ছিলেন। রোকেয়া তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা দিয়ে নারীর অধিকারের প্রশ্নটি তুলেছেন সমাজের কাছে, দেখিয়েছেন নারী স্বাধীনতার প্রশ্নে সমাজ কতটা নির্লিপ্ত। রোকেয়ার সমসাময়িক সমাজে কীভাবে নারীকে বঞ্চিত, অবহেলিত ও শোষিত করেছে সেটি লক্ষ করলে দেখা যায় নারীর অবস্থা অত্যন্ত করুণ ছিল। তখন পুত্রসন্তানকে সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করা হতো। কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া হতো

শুধু ধর্ম, সেলাই, রান্না ইত্যাদি গার্হস্থ্য কর্মকাণ্ড। স্বামীর মনোরঞ্জন, তার সেবাযত্ন, সন্তানধারণ, জন্মদান ও লালন পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল নারী জীবনের সার্থকতা। তবুও সন্তান সম্পর্কিত যাবতীয় সিদ্ধান্ত পুরুষই গ্রহণ করতেন কেননা নারীর কোনো অভিভাবকত্ব ছিল না। নারীর মতামত বরাবরই উপেক্ষিত ছিল। ফলে পরিবারেও যথার্থ সম্মান পেত না নারীরা। সমাজের নিম্নস্তরের নারীর অবস্থা ছিল আরো দুঃসহ, মানবেতর। নারীকে পণ্য হিসেবে গণ্য করার একটি প্রবৃত্তি ছিল পুরুষের মধ্যে। সমাজে নারীর চলাফেরাকে অবরোধের বেড়াজালে শৃঙ্খলিত করে তার মেধা-মনন ও শ্রমকে অবমূল্যায়নের মাধ্যমে তার মানবিক মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। তাই শিক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই নারীর অবস্থান পরিবর্তনের লক্ষ্যে রোকেয়ার ছিল আজীবন সংগ্রাম। তেমনিভাবে বর্তমান সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ এমনকি একটি প্রযুক্তিগত বিপ্লব ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আধুনিক সমাজ নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। নারীর প্রতি মধ্যযুগীয় বর্বরতা আধুনিক সমাজে নৈমিত্তিক ঘটনা। সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে যেমন রয়েছে রোকেয়ার আদর্শ লালন করা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষিত স্বাবলম্বী নারী, ঠিক তেমনিভাবে প্রতিটি শ্রেণিস্তরে কাঠামোগত বৈষম্যের শিকার হওয়া বঞ্চিত-নিষ্পেষিত নারীর তুলনায় সে সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। আর এই জায়গাটিতে এসেই আমরা একই সঙ্গে রোকেয়ার স্বপ্নের বাস্তবায়ন এবং স্বপ্নভঙ্গ দেখতে পাই। ধর্মীয় বিধিনিষেধের অজুহাত, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এবং সুদীর্ঘকালব্যাপী নারীকে অবদমিত করে রাখার প্রচেষ্টা তথাকথিত আধুনিক সমাজকেও শিখিয়েছে কী করে নারীর মেধা-মনন-শ্রমকে অগ্রাহ্য করে তাকে গৃহকোণে ঠেলে দিতে হয়।

রোকেয়ার জীবনীপাঠে জানা যায়, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সাহায্যেও সর্বজনীন কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামির তমসাচ্ছন্নতা থেকে তিনি দুঃসাহসী পদক্ষেপে বেরিয়ে এসে সকল অন্তরায়কে অগ্রাহ্য করে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্নভাবে অবদান রেখে গিয়েছেন। নিম্নে আমরা মহীয়সী এই নারীর সেসব অবদানের উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ তুলে ধরব। কেননা, রোকেয়ার ভাবনা ও আদর্শকে বুঝতে গেলে তাঁর সাহিত্যকর্ম ও নানাবিধ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। তৎকালীন সমাজে নারীদের শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার বিষয়টি রোকেয়ার কাছে সবচেয়ে প্রকট হয়ে ধরা দেয়, যার ফলে মেয়েরা সার্বিকভাবে পিছিয়ে পড়ে। তিনি জানতেন শিক্ষা ব্যতীত নারীজাগরণ সম্ভব নয়। তাই তিনি মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, অভিভাবকদের শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করেন। নারীতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সার্বিক উদ্যোগ নিয়েছেন রোকেয়া 'Sultana's Dream' (১৯০৫) বা 'সুলতানার স্বপ্ন'-এ। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন নারীরা বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আনতে পারেন যুগ পালটানো গবেষণার ধারণা, শীর্ষপর্যায়ে নেতৃত্বদানের মাধ্যমে তাঁরা উৎকর্ষ সাধন করতে পারেন। অথচ বিংশ শতাব্দীর সমাজ এখনো মেয়েদের 'Pink Collar Job'-এর বাইরে ভাবতে পারে না। সেবাধর্মী কাজগুলোতেই কেবল মেয়েরা যাবে– এ যেন সমাজে এক রকম অলিখিত বিধান। এছাড়া বর্তমান আধুনিক সমাজে শিক্ষিত নারীদের নিগৃহীত অবস্থান, ইভটিজিং কিংবা বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েদের অকালে শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়া, মেয়েরা যত পড়াশোনাই করুক না কেন তার মূল উদ্দেশ্য হলো বিয়ের জন্য ভালো পাত্র খুঁজে পাওয়া ও স্বামীর গৃহে ভালো থাকার নিশ্চয়তা– এ যেন সেই রোকেয়ার সমকালীন সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্নতাকেও হার মানায়।

নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির গুরুত্ব অনুধাবন করেই রোকেয়া তৎকালীন নারীদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' বা মুসলিম মহিলা সমিতি। মুসলমান মেয়েদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং তাদের অধিকার আদায়ের জন্য ১৯১৬ সালে রোকেয়া এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতি বিধবা নারীকে অর্থ সাহায্য প্রদান করত। দরিদ্র মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা হতো, অভাবী মেয়েরা সমিতির অর্থে শিক্ষালাভের সুযোগ পেতেন, দুস্থ মহিলাদের কুটিরশিল্পের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। কিন্তু বর্তমান সময়ে কেবল কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ প্রকৃতপক্ষে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি বয়ে আনতে পারছে না। যার ফলে সামগ্রিক অর্থে নারীর ক্ষমতায়ন বিঘ্নিত হচ্ছে। নারীর অগ্রগতির বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে নারী অংশগ্রহণ করছে, তবে অংশীদারিত্ব পাচ্ছে না, ক্ষমতায়ন ঘটছে কিন্তু ক্ষমতায়িত হতে পারছে না। বর্তমান সমাজে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক।

রোকেয়ার নারীবাদের সবচেয়ে বড় গ্রহণযোগ্যতা ও বিশিষ্টতা হচ্ছে তিনি নারীকে মূল্যায়ন করেছেন মানুষ হিসেবে। তিনি মনে করতেন, আত্মমর্যাদার সচেতনতা তৈরি ও আত্মশক্তি বিকশিত করার মাধ্যমে নারীকে তার যথাযথ অধিকার অর্জন করে নিতে হবে। সে উপলব্ধি থেকেই তিনি বলেছেন, 'ভগিনীগণ! চক্ষু রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন– অগ্রসর হউন সকলে। সমস্বরে বল আমরা মানুষ।' সমাজে একজন মানুষ হিসেবে নারীর যথার্থ মর্যাদা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার যে পরামর্শ ছিল রোকেয়ার, সেটি আজকের নারী আন্দোলনেরও মূল বক্তব্য নারীর অধিকার মানবাধিকার।

তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজে রোকেয়া যেমন নারীর অধঃস্তন অবস্থানের জন্য পুরুষকে দায়ী করেছেন, তেমনি নারীর অবস্থান উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি পুরুষকেই অন্যতম সহযোগী হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। একজন নারীবাদী হিসেবে রোকেয়ার অন্যতম সাফল্য হলো, তাঁর সমসাময়িক সমাজে তিনি

পুরুষদের মধ্যেও নবজাগরণ ঘটাতে পেরেছিলেন। কেননা এটি অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে, পুরুষ জেগেছিল বলেই নারীরাও পরবর্তীকালে শিক্ষার সুযোগ পায়।

উনবিংশ শতাব্দীর কঠোর সামাজিক বাস্তবতায় দাঁড়িয়েও রোকেয়া পুরুষকে যেভাবে নারীমুক্তি আন্দোলনে যুক্ত করতে পেরেছিলেন সেই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আধুনিক নারীবাদীরা পুরুষকে অন্তর্ভুক্ত করে উল্লেখযোগ্য ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেনি। এখনো সমাজের বিশাল অংশজুড়ে নারীবিদ্বেষী পুরুষদের সংখ্যা চোখে পড়ার মতো। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিধারী পুরুষরাও নারীবাদ কিংবা নারী অধিকারের প্রশ্নে বিদ্বেষ পোষণ করেন। এই দৃশ্য বারবার রোকেয়ার আদর্শচর্চার প্রয়োজনীয়তাই তুলে ধরে।

একবিংশ শতাব্দীতে এসে সমসাময়িক বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আমাদের নিজেদের অবস্থান থেকে নির্ধারণ করতে হবে রোকেয়াকে। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় নারীমুক্তির লক্ষ্যের পর আমরা সে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পেরেছি কি না কিংবা নিজেদের অবস্থানকে সুসংগঠিত করতে পেরেছি কি না।

নিঃসন্দেহে রোকেয়ার সমসাময়িক সমাজ থেকে আমরা বহুদূর এগিয়ে এসেছি। রোকেয়ার সমকালীন সমাজে যেখানে শিক্ষার মতো একটি মৌলিক অধিকারপ্রাপ্তির সুযোগ থেকেও নারীদের অবরুদ্ধ করে রাখা হতো, সেখানে আজ নারীরা শিক্ষা অর্জনে সেসব সামাজিক বাধাকে বহুলাংশেই পেরিয়ে এসেছে। অনেকগুলো সামাজিক সূচকেই বাংলাদেশ এখন দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যতম দৃষ্টান্ত।

রোকেয়ার নারীবাদী আদর্শের অন্যতম সফলতা 'পুরুষের অন্তর্ভুক্তিকরণ' এখানে অনুসরণীয়। তিনি পুরুষকে সহযোদ্ধা হিসেবেই মূল্যায়ন করেছেন। অতএব, কর্মক্ষেত্রে শুধু নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলেই চলবে না, বরং কার্যকর অর্থেই সেটি নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটাতে পারছে কি না এই জায়গাটিতেও কাজ করতে হবে।

বর্তমানে করোনাকালীন বৈশ্বিক মহামারিতে চাকরি হারিয়ে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর অবস্থার শিকার হচ্ছেন নারীরা, প্রান্তিক নারী বিশেষত যারা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কিংবা ব্যবসায়ী, গৃহপরিচারিকা, ভাসমান নারী অথবা যৌনকর্মী তাঁদের অবস্থা আরো শোচনীয়। এসব অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে না পারলে লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ প্রচেষ্টা অধরাই থেকে যাবে। কেননা, করোনা পরবর্তী নাগরিক জীবনে বৈষম্যের আরো নতুন মাত্রা জেঁকে বসবে। নিজ সময় থেকে শতসহস্র বছর এগিয়ে থাকা রোকেয়া তাই জানিয়ে গিয়েছেন কোথায় কেমন করে নারীকে শক্তি অর্জন করতে হবে, অর্জন করতে হবে নিজের অধিকার। তাই আজকের দিনে এসেও একটি নারীবান্ধব সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে, নারীকে তার প্রাপ্য অধিকারের জায়গায় দেখতে হলে রোকেয়াকে সামনে রেখে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের কাছে এখনো কোনো বিকল্প নেই। একটি সুন্দর আগামীর লক্ষ্যে পরিবর্তন আনয়নে নারী-পুরুষ উভয়েরই একত্রে কাজ করা প্রয়োজন। কেননা, লিঙ্গসমতা অর্জিত হতে পারে কেবল একটি সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে :

* শৈশব থেকেই দেশের প্রতিটি মেয়েকে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা অর্জনে প্রশিক্ষিত করতে হবে। তাছাড়া জেন্ডার নিরপেক্ষ অভিভাবকত্বকে এ ধরনের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রাধান্য দিতে হবে। মেয়েদের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হলে তাদের শিক্ষা অর্জন ও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। ফলে তাদের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে সেটি জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে তাদের সহায়তা করবে। বন্ধুত্বপূর্ণ পারিবারিক কর্মপরিবেশ নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক।

* নারীদের প্রতি ঘটে যাওয়া সকল অদৃশ্য প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটানোর জন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কার্যক্রম, সুযোগ-সুবিধা, নীতিমালা, কর্মপন্থা, লিখিত ও অলিখিত নিয়মাবলি, প্রথা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত পরিবর্তন ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

* মেয়েদের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হলে তা তাদের শিক্ষা অর্জন ও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। ফলে তাদের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে, সেটি জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে তাদের সহায়তা করবে। বন্ধুত্বপূর্ণ পারিবারিক কর্মপরিবেশ নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক।

* নারীরা যেহেতু ঘরে একটি বিশাল পরিমাণ অবৈতনিক গৃহস্থালি কাজ করে থাকে, তাই তাঁদের ওপর অর্পিত এই দায়িত্বগুলো পরিবারের সব সদস্যের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া উচিত। জনসেবামূলক বিধান, টেকসই অবকাঠামো ও সামাজিক নিরাপত্তাসংক্রান্ত নীতিমালার মধ্য দিয়ে গৃহস্থালি সেবামূলক কাজের স্বীকৃতি এবং সেগুলোর পুনর্বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে।

* নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টিকারী সকল আইন কিংবা নীতিমালাকে সংশোধনের মাধ্যমে একটি ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করতে হবে। একটি অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়ন করতে হবে, যাতে করে প্রত্যেক নাগরিক সমান সামাজিক ও আইনি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে। এর মাধ্যমে এমন একটি নাগরিক সমাজ গড়ে তুলতে হবে, যেখানে নারী-পুরুষ একসঙ্গে বৈষম্যহীনভাবে কাজ করতে পারে। এটি প্রমাণিত যে, ক্ষমতার নেতৃত্ব যখন নারীদের হাতে থাকে, তখন তারা নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় উপেক্ষিত বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করতে পারে। একই সঙ্গে তারা প্রতিবন্ধকতাগুলো মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

* নাগরিক জীবনের যে-কোনো পর্যায়ে, অনলাইন কিংবা অফলাইনে, নারীর প্রতি হওয়া সহিংসতাকে জঘন্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত করে আইনি অবকাঠামোগুলোকে ব্যাপক সংস্কারের মধ্যদিয়ে বিচারহীনতার সংস্কৃতিকে দূর করতে হবে। যৌন হয়রানিবিরোধী আইনে মৌখিক গালিকেও অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

* ২০০৯ সালে বাংলাদেশ হাইকোর্ট ডিভিশন কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে একটি আদেশ জারি করেন। যেখানে কোর্ট বলেন, প্রত্যেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধক কমিটি থাকতে হবে। তাই সবধরনের কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধক কমিটি গঠন করতে হবে, যাতে নারীরা সেখানে তাদের অভিযোগ দায়ের করতে পারে এবং প্রয়োজনে সাহায্য চাইতে পারে। গঠিত কমিটি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কঠোর জবাবদিহিতায় বাধ্য করতে পারে, এমনকি প্রয়োজন সাপেক্ষে তাকে আইনের হাতে সোপর্দ করতে পারে। প্রত্যেক রাজনীতিবিদের জন্য বাধ্যতামূলক জেন্ডার সংবেদনশীল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আইনের কার্যকারিতা ও সেগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলোকে বুঝতে হলে প্রতিটি আইনের যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও যাচাই-বাছাই প্রয়োজন।

* বাংলা, ইংরেজি, মাদরাসা, শহর কিংবা গ্রামে যে-কোনো শিক্ষা মাধ্যমে সেক্স এডুকেশনকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

* জেন্ডার বিষয়ক সংবেদনশীলতা ও জ্ঞান তৈরির লক্ষ্যে সর্বস্তরের শিক্ষকদের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে।

* সমাজের ও ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে জেন্ডার সংবেদনশীলতা তৈরির লক্ষ্যে সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

* নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা সকল নারী সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন কিংবা নারীবাদী আন্দোলনে যুক্ত সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

* নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লৈঙ্গিক পরিচয়, প্রতিবন্ধিতা কিংবা অন্য যে-কোনো পশ্চাৎপদতার ভিত্তিতে সকল প্রান্তিক নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে তাদের জন্য সংসদে সংরক্ষিত আসন ও তার কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে।

* নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারি চাকরিতে যৌক্তিক পরিমাণ কোটা ব্যবস্থা রাখতে হবে।

* নারীদের অগ্রগতির জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তার পরিমাণ বাড়াতে হবে।

* গতানুগতিক সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও তথ্যের সহজলভ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনগুলোতে জনজীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নারীর ভূমিকার চিত্র তুলে ধরে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে। নারীর অংশগ্রহণ ও তার প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কিত যে-কোনো গবেষণার জন্য সরকারি বরাদ্দ থাকতে হবে।

লেখক : অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বেগম রোকেয়া : নারীজাগরণের পথিকৃৎ

জাকিয়া কে হাসান

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন একজন কৌতূহলী ও অনুসন্ধিৎসার আধার, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সংমিশ্রণ, জগৎ ও সমাজ পরিবর্তনে পথপ্রদর্শক। যুক্তিবাদী মনোভাব ও নারী শিক্ষার অভাবই নারী পশ্চাৎপদতার কারণ বলে তাঁর বিশ্বাস। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীকে হতে হবে স্বাবলম্বী। প্রতিষ্ঠিত হতে হবে নারী-পুরুষের সমতা।

নারী শিক্ষা, ক্ষমতায়ন ও তাদের ভোটাধিকারের জন্য বেগম রোকেয়া আমৃত্যু লড়াই করে গেছেন। উনবিংশ শতকে নারীরা যখন অবরোধবাসিনী, সেই সময়ে নারীর পরাধীনতার বিরুদ্ধে তিনি আওয়াজ তুলেছেন। তিনি নারীজাগরণের অগ্রদূত, সমাজসংস্কারক এবং প্রথম বাঙালি মুসলমান নারীবাদী। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে তিনি প্রথম নারী, যিনি নারী স্বাধীনতার পথিকৃৎ ছিলেন।

বেগম রোকেয়ার জন্ম ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর। রংপুরের পায়রাবন্দে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারের সন্তান তিনি। বাবা জহিরউদ্দিন মুহম্মদ আবুল আলী হায়দার সাবের, মা রাহাতুন্নেছা চৌধুরানী। বেগম রোকেয়ার ছিল দুই ভাই ও দুই বোন। বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের ছিলেন একজন প্রগতিশীল মানুষ। তিনি অগোচরে মোমের আলোয় বেগম রোকেয়া ও তাঁর বোন করিমুন্নেছাকে বর্ণ শিক্ষা দিতেন। রোকেয়ার ছিল জ্ঞানের প্রতি অদম্য আগ্রহ।

১৮৯৬ সালে ১৬ বছর বয়সে বেগম রোকেয়ার বিয়ে হয় ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। রোকেয়া পেলেন আরেকজন প্রগতিশীল মানুষের সাহচার্য। স্বামী সাখাওয়াত হোসেন বেগম রোকেয়ার লেখাপড়ার প্রতি অকুণ্ঠ আগ্রহ দেখে বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে শিক্ষা দিতেন এবং সেই সাথে তাঁর লেখালেখিতেও সহযোগিতা করতেন।

এই শিক্ষাই তাঁকে শিখিয়েছিল, সেই সময়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবন থেকে মুক্তি পেতে হবে। ভেবেছিলেন শিক্ষাহীন নারীসমাজের মুক্তির কথা। নারীদের

* নাগরিক জীবনের যে-কোনো পর্যায়ে, অনলাইন কিংবা অফলাইনে, নারীর প্রতি হওয়া সহিংসতাকে জঘন্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত করে আইনি অবকাঠামোগুলোকে ব্যাপক সংস্কারের মধ্যদিয়ে বিচারহীনতার সংস্কৃতিকে দূর করতে হবে। যৌন হয়রানিবিরোধী আইনে মৌখিক গালিকেও অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

* ২০০৯ সালে বাংলাদেশ হাইকোর্ট ডিভিশন কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে একটি আদেশ জারি করেন। যেখানে কোর্ট বলেন, প্রত্যেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধক কমিটি থাকতে হবে। তাই সবধরনের কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধক কমিটি গঠন করতে হবে, যাতে নারীরা সেখানে তাদের অভিযোগ দায়ের করতে পারে এবং প্রয়োজনে সাহায্য চাইতে পারে। গঠিত কমিটি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কঠোর জবাবদিহিতায় বাধ্য করতে পারে, এমনকি প্রয়োজন সাপেক্ষে তাকে আইনের হাতে সোপর্দ করতে পারে। প্রত্যেক রাজনীতিবিদের জন্য বাধ্যতামূলক জেন্ডার সংবেদনশীল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আইনের কার্যকারিতা ও সেগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলোকে বুঝতে হলে প্রতিটি আইনের যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও যাচাই-বাছাই প্রয়োজন।

* বাংলা, ইংরেজি, মাদরাসা, শহর কিংবা গ্রামে যে-কোনো শিক্ষা মাধ্যমে সেক্স এডুকেশনকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

* জেন্ডার বিষয়ক সংবেদনশীলতা ও জ্ঞান তৈরির লক্ষ্যে সর্বস্তরের শিক্ষকদের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে।

* সমাজের ও ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে জেন্ডার সংবেদনশীলতা তৈরির লক্ষ্যে সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

* নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা সকল নারী সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন কিংবা নারীবাদী আন্দোলনে যুক্ত সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

* নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লৈঙ্গিক পরিচয়, প্রতিবন্ধিতা কিংবা অন্য যে-কোনো পশ্চাৎপদতার ভিত্তিতে সকল প্রান্তিক নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে তাদের জন্য সংসদে সংরক্ষিত আসন ও তার কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে।

* নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারি চাকরিতে যৌক্তিক পরিমাণ কোটা ব্যবস্থা রাখতে হবে।

* নারীদের অগ্রগতির জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তার পরিমাণ বাড়াতে হবে।

* গতানুগতিক সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও তথ্যের সহজলভ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনগুলোতে জনজীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নারীর ভূমিকার চিত্র তুলে ধরে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে। নারীর অংশগ্রহণ ও তার প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কিত যে-কোনো গবেষণার জন্য সরকারি বরাদ্দ থাকতে হবে।

লেখক : অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অশিক্ষার অন্ধকার থেকে কীভাবে তুলে আনা যায়, সে ভাবনাই তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখত। এ কারণেই তিনি স্বপ্ন দেখতেন একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার, যেখানে সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীরা লেখাপড়া শিখবে। তাঁর এ স্বপ্নের একমাত্র সহযোগী হলেন তাঁর স্বামী সাখাওয়াত হোসেন।

'পিপাসা' নামে একটি বাংলা গল্প ১৯০২ সালে লিখে বেগম রোকেয়ার সাহিত্যের জগতে প্রবেশ। এরপর ১৯০৫ সালে রোকেয়া ইংরেজিতে লিখলেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সুলতানাস ড্রিম'। সাখাওয়াত হোসেন লেখাটি পড়ে অভিভূত হলেন এবং লেখাটি বই আকারে প্রকাশ করার জন্য তাঁকে উৎসাহ দেন।

'সুলতানাস ড্রিম' ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে বইটি বাংলায় 'সুলতানার স্বপ্ন' নামে প্রকাশিত হয়। এই বইটিকে বিশ্বের নারীবাদী সাহিত্যে একটি মাইলফলক হিসেবে গণ্য করা হয়। এরপর থেকে তিনি রোকেয়া খাতুন, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, মিসেস আর এস হোসেন নামে লেখালেখি ও পরিচিতি লাভ করেন।

রোকেয়া তাঁর নারীবাদী চিন্তার প্রকাশ ঘটান 'মতিচূর' প্রবন্ধ সংগ্রহের প্রথম (১৯০৪) ও দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯২২)। সুলতানার স্বপ্ন (১৯০৫), পদ্মরাগ (১৯২৪), অবরোধবাসিনী (১৯৩১) তাঁর সৃজনশীল রচনা। গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে তাঁর লেখা নবনূর, সওগাত, মোহাম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এসব প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আর লিঙ্গ সমতার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন। হাস্যরস আর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অসম অবস্থান ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি তাঁর প্রত্যেকটি রচনায় তুলে ধরেছেন যে, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, ধর্মের নামে নারীর প্রতি অবিচার রোধ, শিক্ষা আর পছন্দ অনুযায়ী পেশা নির্বাচনের সুযোগ ছাড়া নারীর মুক্তি অসম্ভব।

বেগম রোকেয়ার বিবাহিত জীবন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ১৯০৯ সালের ৩ মে স্বামীর মৃত্যুর পর আত্মপ্রকাশ করলেন এক নতুন বেগম রোকেয়া। লেখালেখির বাইরে সমাজে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং নারী শিক্ষার বিস্তারে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি– এ বিষয়ে ২০০৪ সালে বিবিসি বাংলা একটি শ্রোতা জরিপের আয়োজন করে। ৩০ দিনের ওপর চালানো জরিপে শ্রোতাদের ভোটে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ২০ জনের জীবন নিয়ে বিবিসি বাংলায় বেতার অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় ২০০৪-এর ২৬ মার্চ থেকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত। বিবিসি বাংলার সেই জরিপে শ্রোতাদের মনোনীত শীর্ষ ২০ জন বাঙালির তালিকায় ৬ষ্ঠ স্থানে আসেন বেগম রোকেয়া। বাঙালির আধুনিক যুগের ইতিহাসে যে নারীর নাম গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়, সেই নাম হচ্ছে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।

বেগম রোকেয়াকে নিয়ে তৈরি হয় প্রথম তথ্যচিত্র। তথ্যচিত্র নির্মাতা বাণী দত্ত। তিনি বলেন, বেগম রোকেয়া নিজেই বলে গেছেন তাঁকে ৫ বছর বয়স থেকে পর্দা করতে হতো। সেই পর্দাকে পরিণত বয়সে মনের ভেতর থেকে তিনি কখনোই সমর্থন করেননি। কিন্তু মেয়েদের অভিভাবকরা যাতে তাদের স্কুলে পাঠায় তার জন্য তিনি নিজে পর্দা করে, বোরকা পরে মেয়েদের বাড়ি বাড়ি যেতেন। তিনি আরো বলেন, বেগম রোকেয়া নিজের সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে তাঁর স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি কলকাতার একটি নামকরা মেয়েদের সরকারি স্কুল 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল'।

এই স্কুলটি তিনি প্রথম শুরু করেন ভাগলপুরে ১৯০৯ সালের ১ অক্টোবর। তারপর পারিবারিক কারণে বেগম রোকেয়া ভাগলপুর ছেড়ে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন এবং ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ কলকাতার ১৩নং ওয়ালিউল্লাহ লেনের একটি বাড়িতে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'। ওই সময় মাত্র আটজন ছাত্রীকে নিয়ে কলকাতায় শুরু হয়েছিল এ স্কুলের যাত্রা। *(সূত্র : বিবিসি বাংলা)*

নারীর শিক্ষা গ্রহণ, নারীর বাইরে চলাফেরা এবং কাজের অধিকার, স্বাধীন চিন্তা-চেতনার অধিকার– এই বিষয়গুলো যে নারীর মুক্তির সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়গুলো নিয়েই বেগম রোকেয়া সারাজীবন কাজ করেছেন। এছাড়া, তাঁর সমস্ত কিছুর মাঝে ছিল প্রচণ্ড বিদ্রোহ। প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান, নারীর প্রতি তৎকালীন সমাজের প্রচলিত যে দৃষ্টিভঙ্গি–এ সবকিছু নিয়ে সমাজের বিবেককে দিয়েছিলেন ধিক্কার। তাঁর লেখার মাধ্যমে নারীর এগিয়ে চলার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং নারী-পুরুষের মধ্যে সমতার পক্ষে তিনি যুক্তি তুলে ধরেন। লিখেছেন নারীর সমাজে অসম অবস্থানের কথাও।

রোকেয়া অলংকারকে দাসত্বের প্রতীক বিবেচনা করেছেন এবং নারীদের অলংকার ত্যাগ করে আত্মসম্মানবোধে উজ্জীবিত হয়ে আর্থ-রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে সচেষ্ট হতে আহ্বান জানান।

'আমরা বহুকাল হইতে দাসীপনা করিতে করিতে দাসীত্বে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। ক্রমে পুরুষরা আমাদের মনকে পর্যন্ত দাস করিয়া ফেলিয়াছে।...তাহারা ভূস্বামী গৃহস্বামী প্রভৃতি হইতে হইতে আমাদের 'স্বামী' হইয়া উঠিয়াছেন।... আর এই যে আমাদের অলঙ্কারগুলি এগুলি দাসত্বের নিদর্শন। ... কারাগারে বন্দিগণ লৌহ নির্মিত বেড়ী পরে, আমরা স্বর্ণ রৌপ্যের বেড়ী পরিয়া বলি 'মল' পরিয়াছি। উহাদের হাতকড়ী লৌহ নির্মিত, আমাদের হাতকড়ী স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত 'চুড়ি'।... অশ্ব হস্তী প্রভৃতি পশু লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ আমরা স্বর্ণশৃঙ্খলে কণ্ঠ শোভিত করিয়া বলি 'হার পরিয়াছি!' গো-স্বামী

বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া 'নাকা দড়ী' পরায়, আমাদের স্বামী আমাদের নাকে 'নোলক' পড়াইয়াছেন। অতএব দেখিলে ভগিনি, আমাদের ঐ বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি দাসত্বের নিদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে! ... অভ্যাসের কি অপার মহিমা! দাসত্বে অভ্যাস হইয়াছে বলিয়া দাসত্বসূচক গহনাও ভালো লাগে। অহিফেন তিক্ত হইলেও আফিং চির অতি প্রিয় সামগ্রী। মাদক দ্রব্যে যতই সর্বনাশ হউক না কেন, মাতাল তাহা ছাড়িতে চাহে না। সেইরূপ আমরা অঙ্গে দাসত্বের নিদর্শন ধারণ করিয়া ও আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করি। ... হিন্দু মতে সধবা স্ত্রীলোকের কেশকর্ত্তন নিষিদ্ধ কেন? সধবা নারীর স্বামী ক্রুদ্ধ হইলে স্ত্রীর সুদীর্ঘ কুন্তলদাম হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া উত্তম মধ্যম দিতে পারিবে। ... ধিক আমাদিগকে! আমরা আশৈশব এই চুলের কত যত্ন করি! কি চমৎকার!! *(সূত্র: উইকিপিডিয়া, বেগম রোকেয়া ১৯০৪)*

বেগম রোকেয়া ছিলেন অসামান্য দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। তাঁর লেখার মধ্যে ছিল একটা অসাধারণ স্বপ্ন যে, নারীরা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে।

'পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী কেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী ব্যারিস্টার, লেডী জজ সবই হইব!...উপার্জ্জন করিব না কেন?... যে পরিশ্রম আমরা 'স্বামী'র গৃহকার্য্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?...আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীন তেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহুলতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না'? *(সূত্র : উইকিপিডিয়া, বেগম রোকেয়া, ১৯০৪)*

এ ধ্যান-ধারণায় এসেছে পরিবর্তন। নারীর অবস্থা ও অবস্থানে রয়েছে পরিবর্তনের ছাপ। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, সেনা, নৌ, পুলিশ, বিজিবি, সাহিত্য, শিল্পসহ সর্বোচ্চ বিচারিক কাজেও নারীর অংশগ্রহণ ও সাফল্য এখন লক্ষণীয়। প্রশাসন, বিচার বিভাগ, শিক্ষাঙ্গন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী– সর্বত্রই নিঃসংকোচে নারীরা চৌকসভাবে দায়িত্ব পালন করছে। কুটনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, শিল্প সংস্কৃতি, খেলাধুলা থেকে পর্বতারোহণ– সর্বত্র নারী নিঃসংকোচে দায়িত্ব পালন করছে, দক্ষ হাতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণেও কাজ করছে নারী। বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর বাংলাদেশের বর্তমান প্রজন্ম। তাঁর দেখানো পথেই হাঁটছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর সেই সুদূরপ্রসারী দূরদর্শিতার বাস্তবচিত্র আজ বাংলাদেশ তথা বিশ্বে নারী নেতৃত্ব বা নারীর চিন্তাধারা সুপ্রতিষ্ঠিত।

শুধু শিক্ষা নয়, নারীর সার্বিক মুক্তির কথা চিন্তা করেছিলেন বেগম রোকেয়া। নারীজাতি এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতার বিষয়ে তাঁর এক প্রবন্ধে তিনি নারী-পুরুষের সমতার যে আদর্শের কথা লিখে গেছেন, তা আজকের দিনে নারীসমাজের জন্য আদর্শ। বাঙালি সমাজ যখন ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা আর সামাজিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই সময় বেগম রোকেয়া বাংলার মুসলিম নারীসমাজে শিক্ষার আলো নিয়ে এসেছিলেন। বেগম রোকেয়ার আদর্শে আজকের নারীরা অনুপ্রাণিত। আজ এরই ধারাবাহিকতায় সারা বিশ্বের নারী বিশেষ করে বাংলাদেশের নারীসমাজ উজ্জীবিত।

বাঙালি নারীজাগরণের অগ্রদূত আমাদের পথপ্রদর্শক বেগম রোকেয়ার জীবনাবসান হয় ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর। এই মহীয়সী নারীর জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী একই দিনে। তিনি ক্ষণজন্মা এক মহিয়সী নারী। আজ বিশ্বব্যাপী নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ।

তাঁর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

লেখক : নির্বাহী পরিচালক, দীপ্ত ফাউন্ডেশন

বেগম রোকেয়া: সমতা ও অগ্রগতির প্রতীক

রঞ্জন কর্মকার

দক্ষিণ এশিয়ায় নারীজাগরণের অগ্রদূত হিসেবে বিবেচিত বেগম সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) ছিলেন এই উপমহাদেশের নারীমুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টাদের অন্যতম। বাঙালির আধুনিক যুগের ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে নারীর নাম গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়, সেই নাম হচ্ছে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বা বেগম রোকেয়া। তিনি একাধারে একজন সমাজসংস্কারক, নারীশিক্ষা প্রচারক এবং সাহিত্যিক হিসেবে সর্বজনবিদিত ছিলেন। বহু যুগ আগে তিনি যে নারীজাগরণের কথা বলে গেছেন, নারীশিক্ষা ও মুক্তির পথ দেখিয়েছেন, নারীদের জেগে ওঠার তাগিদ দিয়ে গেছেন তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। তাঁর জীবন, কর্ম ও বাণী আজও আমাদের পথ দেখায়, অনুপ্রেরণা জোগায়। বুদ্ধি-প্রজ্ঞা, সৎসাহস, কর্মক্ষমতা ও সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক হিসেবে সমকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বেড়াজাল থেকে দৃঢ়পদে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি। হয়ে উঠেছিলেন এই উপমহাদেশের নারীর অগ্রগতি ও ক্ষমতায়নের অগ্রদূত। ২০০৪ সালে বিবিসি বাংলা আয়োজিত শ্রোতা জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় তিনি ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন।

বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন ছিল একটি ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এদেশের নারীসমাজ তাঁরই প্রদর্শিত পথে হেঁটে ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের অন্ধকার থেকে বাইরের আলোকিত জীবনের দিকে অগ্রযাত্রা শুরু করতে সক্ষম হয়েছে– এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়। বাঙালি সমাজ যখন ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই সময় বেগম রোকেয়া বাংলার মুসলিম নারীসমাজে শিক্ষার আলো নিয়ে এসেছিলেন। তিনিই প্রথম বলেছিলেন, 'আমরা পুরুষের ন্যায় সাম্যক সুবিধা না পাইয়া পশ্চাতে পড়িয়া আছি' এবং 'কন্যারা জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত দেশমাতৃকার মুক্তি অসম্ভব।' তিনিই নারীদের উপলব্ধি করতে শিখিয়েছিলেন, 'আমরা সমাজের অর্ধাঙ্গ, আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কীরূপে? কোনো ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের ভিন্ন নহে। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্য তাহাই।' তাঁর লড়াই ছিল সকল প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং অধস্তন অবস্থায় থাকা মানুষের পক্ষে। তিনি শুধু পিছিয়ে পড়া নারীদেরই নয়, সমাজে পশ্চাৎপদে থাকা সকল মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ব্যক্তিকে যেমন উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছেন, তেমনি রাষ্ট্র ও সমাজকেও উদ্যোগী হতে বলেছেন। তিনি সকল অচলায়তন ভাঙতে বলেছেন, চ্যালেঞ্জ করেছেন সব কুসংস্কার ও কুযুক্তিকে।

তিনি বুঝেছিলেন, সমতা ও অগ্রগতি একে অপরের পরিপূরক। তাই তিনি মানুষের অগ্রগতির মূল বাধা বৈষম্য ও অসম অবস্থানকে চিহ্নিত করে তা দূর করার জন্য নীতিগত উদ্যোগ ও যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের কথা বলেছেন। বেগম রোকেয়া ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন এবং সমাজকে অসাম্প্রদায়িক করে গড়ে তোলার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে বলেছেন। আধুনিক বাংলা সমাজের সফল প্রতিষ্ঠাতা ও সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীগণ তৎকালীন সমাজের প্রকট সমস্যাগুলো দূরীকরণে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার সাধন, যুক্তির আলোকে ধর্মীয় শৃঙ্খল ভেঙে নারীর স্বাধীনতা ও নারী মুক্তি, সাহিত্যে পুনর্জাগরণ, অর্থনৈতিক সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে অবদান রেখেছিলেন। এই পরিবর্তনমুখী সময়কালে ১৮৮০ সালে বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাই এটা বলা যায় যে, তিনি বাংলার রেনেসাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন। তাঁর জীবনদর্শন, কর্মকাণ্ড, সাহিত্য ও শিক্ষানুরাগ, লেখনী ও বক্তব্যে

সেটির প্রতিফলন পাওয়া যায়। ঐ সময়ের অগ্রপথিকদের সাহিত্যচর্চা ও কর্মকাণ্ড তাঁকে প্রভাবিত করেছিল বলেই তিনি ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবিকতাবোধ নিজের মধ্যে ধারণ করতে পেরেছিলেন এবং এর আলোকে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করেছিলেন।

রোকেয়াই প্রথম বাঙালি মুসলমান সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীর শিক্ষা, সমান মর্যাদা ও অধিকারের দাবি তুলে ধরেন এবং নারীর জীবন ও কর্মের স্বাধীনতার পক্ষে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত প্রচার করেন। তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন, 'শিক্ষালাভ করা সব নর-নারীর অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু আমাদের সমাজ সর্বদা তাহা অমান্য করেছে।' তিনি নারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, 'ভগিনীরা! চক্ষু রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন– অগ্রসর হউন! মাথা ঠুকিয়া বলো মা! আমরা পশু নই; বলো ভগিনী! আমরা আসবাব নই; বলো কন্যে আমরা জড়োয়া অলঙ্কাররূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বলো আমরা মানুষ।' মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'মেয়েদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ জননী এবং আদর্শ নারীরূপে পরিচিত হইতে পারে।'

নারীদের শিক্ষা ও সাংগঠনিক কর্মতৎপরতার প্রসারের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন কাজ করতে গিয়ে তিনি বাঙালি জীবনের সংকটের বিভিন্ন দিক খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করেন। এ থেকে প্রতিকারে করণীয়গুলো তিনি তাঁর বক্তব্যে, কর্মকাণ্ডে ও লেখনীতে বারবার উল্লেখ করেছেন। তাঁর রচনাগুলোকে নারীবাদী সাহিত্যের মাইলফলক হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। অবরোধপ্রথা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহসহ নানা কুপ্রথা ও সংস্কারের কুফল; নারীদের প্রতি সামাজিক অবমাননা, শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যমে পুরুষশাসিত সমাজের অর্গল ভেঙে বেরিয়ে এসে সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা, নিজ পছন্দ অনুযায়ী পেশা নির্বাচন করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুরবস্থা কাটিয়ে ওঠার অনুপ্রেরণা ইত্যাদি ছিল তাঁর লেখার উপজীব্য।

শিক্ষানুরাগ ও সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি তিনি একজন নিভৃতচারী সুদূরপ্রসারী রাজনীতিকও ছিলেন বটে। অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতার অধিকারী রোকেয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নানা সামাজিক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর দৃঢ়সংকল্প ছিল নারীমুক্তির পথ তৈরি করা। একশো বছর পরও আমরা তাঁর দেখানো সেই পথ ধরেই হেঁটে চলেছি। আজ দীর্ঘসময় ধরে দেশের সর্বোচ্চ নির্বাহী পদে ক্ষমতাসীন একজন নারী। জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও স্পিকার নারী। এছাড়াও রাজনীতিতে ও বিভিন্ন উচ্চপদে আসীন অনেক নারী বেগম রোকেয়ার দেখা সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটিয়ে চলেছেন, একটা সময় যা অলীক কল্পনা বলেই মনে করা হতো।

সময়ের প্রেক্ষাপটে নারীদের অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এদেশে তৈরি হয়েছে নারীবান্ধব সংবিধান, আইনকানুন ও নীতিমালা। তাদের চাহিদা, সমস্যা ও সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রণীত হচ্ছে দেশের সমস্ত সরকারি-বেসরকারি কর্মপরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি। সমাজের প্রতিটি অংশ আজ নারীদের পদচারণায় মুখরিত। তাদের অংশগ্রহণে পরিপূর্ণ মাত্রা পেয়েছে ব্যক্তি, সমাজ ও জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অঙ্গনসহ সর্বত্র তাদের উপস্থিতি এখন বিগত যে-কোনো সময়ের তুলনায় চোখে পড়ার মতো। বেগম রোকেয়া চেয়েছিলেন, নারী ও পুরুষ উভয়েই যেন সমাজে সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে বাঁচতে পারেন। তিনি নারী ও পুরুষকে একটি গাড়ির দুটি চাকার সঙ্গে তুলনা করেছেন– যে দুটি চাকা সমান না হলে গাড়ি চলতে পারবে না। আজ যে নারীরা শিক্ষায় অগ্রাধিকার পাচ্ছে, ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে, খেলাধুলা-সংস্কৃতি-রাজনীতি সর্বত্র দাপটের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে তার কিছুই সম্ভব হতো না, যদি একজন বেগম রোকেয়া নারীদের সমান অধিকার, মর্যাদা ও অংশগ্রহণের দাবিতে আওয়াজ না তুলতেন। তাঁর লেখনীর মাধ্যমেই সকলে নারীশিক্ষা ও অংশগ্রহণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুর কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা জনগণের ভোটে ক্ষমতায় এসে প্রতিটি ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর দর্শন, চিন্তা ও স্বপ্নকে সামনে রেখে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য কাজ শুরু করেন। তিনি নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য কমিয়ে এনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনে নারী-পুরুষের সমঅংশগ্রহণ, সমঅধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৯৯৭ সালে ঘোষণা করেন জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা। উক্ত নীতিমালা তৈরির পিছনে কাজ করেছে বঙ্গবন্ধুর দর্শন, চিন্তা এবং স্বপ্ন।

বর্তমান সময়ে নারীদের সবচেয়ে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। অথচ একটা সময়ে এই দেশে মেয়েদের পড়ালেখা করার কথা ভাবাই যেত না। অবরোধ প্রথা ও ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে যুগ যুগ ধরে নারী শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে না পারায় সবসময় পরিবার তথা পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে ঘরবন্দি জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে। নারীকে শিক্ষা অর্জন করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার কথা বেগম রোকেয়াই প্রথম স্পষ্টভাবে বলেন। সমাজের সব স্তরে নারীর অধস্তনতা দূর করে নারীকে আত্মশক্তি ও আত্মমর্যাদায় বলীয়ান হতে হলে নারীশিক্ষার প্রসার ও অবরোধ প্রথার অবসান যে আশু প্রয়োজন, সে কথাও রোকেয়া তাঁর জবানী এবং রচনায় সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। অনেক বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে তিনি নিজে পড়াশুনা শিখেছিলেন এবং

অন্যান্য মেয়েরাও যাতে তাঁর মতো শিক্ষিত হতে পারে সেজন্য আজীবন নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেখানে ছাত্রী ভর্তির জন্য নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়েছেন, সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য অব্যাহত সংগ্রাম করেছেন।

তিনি বলেছিলেন, 'মেয়েদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ জননী এবং আদর্শ নারীরূপে পরিচিত হইতে পারে।' আসলে মেয়েদের পড়ালেখার গুরুত্ব বেগম রোকেয়া তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝেছিলেন। তাই তিনি তাঁর অসংখ্য লেখায় স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং লিঙ্গ সমতার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন। হাস্যরসের মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নারীর অসম অবস্থান ফুটিয়ে তুলে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। তিনিই প্রথম নারীদের সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করার কথা ভেবেছিলেন। সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবামূলক নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর চেতনা হাজারো নারী-পুরুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের অনেকেই বেগম রোকেয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ১৯৭২-এ প্রণীত সংবিধানে প্রদত্ত জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅধিকার আদায়ের দাবিতে কর্মরত নারী ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো তাদের নারীবাদী আদর্শ গঠনে বেগম রোকেয়ার ধ্যান-ধারণা থেকে প্রেরণা লাভ করেছেন।

বেগম রোকেয়ার সব সৃষ্টি ও সাহিত্যকর্মের আবেদন এখনও সমানভাবে আলোড়িত করে আমাদের। স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর স্বপ্নগুলো নারীদের জীবনের অমোঘ সত্য ও সম্ভাবনা হয়ে ধরা দিচ্ছে। তবে এখনো আমাদের অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছুর প্রেক্ষাপট বদলে গেলেও সমাজসংস্কারের মৌলিক চিন্তাভাবনা বা চেতনার জায়গাটি কিন্তু একই রয়ে গেছে। নারী এখন অবরোধবাসিনী না হলেও এখনো অনেকের ভাবনাচিন্তায় নারীর সমান মর্যাদা ও অধিকার প্রাপ্তির বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক নারী শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। আবার শহুরে বা শিক্ষিত অনেক নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েও পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। বাল্যবিয়ে, ড্রপআউট, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, অর্থনৈতিক শোষণ, খাদ্য-পুষ্টির বঞ্চনা এখনো প্রবলভাবে বিদ্যমান। শিক্ষিত নারী-পুরুষের অনেকের মন ও মননে পুরুষতান্ত্রিক প্রভাব ও গোঁড়ামি রয়েছে। নারীকে এখনো অনেকক্ষেত্রে অসহায়, অধস্তন ও পরমুখাপেক্ষী ভাবা হয় বা করে রাখা হয়। বর্তমান বাংলাদেশে আমরা বেগম রোকেয়া ও তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরিদের আদর্শ ও অনুপ্রেরণায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমসুযোগ ও সমঅধিকার অর্জনের সংগ্রামে জয়ী হব- এই আশা নিয়েই পথ চলছি।

লেখক : নির্বাহী পরিচালক, স্টেপ্‌স টুয়ার্ড্‌স ডেভেলপমেন্ট

বেগম রোকেয়ার স্মরণীয় উক্তি

"আমি চাই সেই শিক্ষা- যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে, তাহাদিগকে আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ গৃহিণী এবং আদর্শ মাতারূপে গঠিত করিবে!" *(সুবেহ সাদেক, পৃষ্ঠা-৪০০)*

বাংলার নারীজাগরণ ও নারী শিক্ষার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

সুরমা জাহিদ

বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অসীম ধৈর্যের সাথে বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে, বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে যিনি বাংলাদেশ তথা সমগ্র বাংলা তথা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের নারীদের আজকের এই উন্নয়নের রূপকার, তিনি বাংলার মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। সেই মহীয়সী নারী কর্তৃক বাংলার নারীদের উন্নয়নে তাঁর চিন্তাধারা, বিকাশের সূত্রপাত, প্রচলিত কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসার উপায় সন্ধান, ধারাবাহিক কর্মকৌশল নির্ধারণ ও সময়ের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে ধীরে ধীরে তা বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগসমূহ যদি আমরা জানতে পারি এবং নিয়মিতভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এটির ব্যাপক প্রচার করতে পারি, তাহলে এই কৌশলসমূহ থেকে বাংলার নারীরা তাদের উন্নয়নের বর্তমান অবস্থা থেকে আরো উন্নত সোপানে উত্তরণ ও আরোহণের নতুন নতুন উপায় খুঁজে বের করার চিন্তায় নিজেদের নিয়োজিত করে তারা ক্রমশ এগিয়ে যেতে পারবেন।

এমন এক সময়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে সেই মহীয়সী নারীর জন্ম, যখন বাংলার নারীরা ছিলেন এক অন্ধকারময় জগতে। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশেই মেয়েদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ– যা অকল্পনীয়। যে-কোনো বিষয়েই বাংলার নারীদের বিশেষত মুসলিম নারীদের জন্য 'না' শব্দটি বেশি প্রযোজ্য ছিল। তারা সেই সময়ে কঠিন এক অনুশাসন ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশের মাঝে ছিলেন। স্বাধীনভাবে বাইরে চলাফেরা করতে পারতেন না। শিক্ষায়, জ্ঞানচর্চায় বা যে কোনো বিষয়ে যে-কোনো পর্যায়ে যে-কোনো ধরনের মতামত প্রকাশে তাদের কোনো অধিকার ছিল না।

সময়ের সাহসী চিন্তক ও তা বাস্তবায়নকারী এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের শৃঙ্খল থেকে নারীকে মুক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাওয়া সংগ্রামী জীবনের অধিকারী বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের ইংরেজি, বাংলা, আরবিসহ বহু ভাষায় পারদর্শী হলেও মেয়েদের শিক্ষায় ছিলেন রক্ষণশীল। সেসময় পরিবারে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর কোনো প্রচলন ছিল না। সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ঘরের বাইরে যেয়ে মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভেরও কোনো সুযোগ ছিল না। শুরুতে বেগম রোকেয়া দাদার কাছে গোপনে অল্প অল্প উর্দু ও বাংলা পড়া শেখেন। বড় দুই ভাই মোহাম্মদ ইব্রাহিম আবু আসাদ সাবের ও খলিলুর রহমান আবু যায়গাম সাবের এবং বড় বোন করিমউন্নেসা ছিলেন বিদ্যানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী ও প্রগতিশীল। বড় দুই ভাই কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়াশুনা করে তাঁরা আধুনিক মনোভাবাপন্ন হন। বেগম রোকেয়ার শিক্ষা, সাহিত্যচর্চা ও নারীকে শৃঙ্খলমুক্ত করে তাঁদের অগ্রযাত্রায় সার্বিক উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিতকরণে তাঁরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শিশুবয়সে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় বসবাসকালীন একজন শিক্ষিকার নিকট তিনি লেখাপড়ার যে সুযোগ পেয়েছিলেন, সমাজ ও আত্মীয়স্বজনদের তীর্যক সমালোচনায় তা আর বেশি দূর এগোয়নি। তারপরও রোকেয়া থেমে যাননি। লেখাপড়ার প্রতি তাঁর অদম্য ইচ্ছার কারণেই বড় ভাইবোনদের সহযোগিতায় তিনি অল্প বয়সেই আরবি, ফারসি, উর্দু, বাংলা ও ইংরেজি আয়ত্ত করেন। রোকেয়ার জ্ঞানপিপাসা ছিল অসীম। জানার ও শিক্ষার প্রতি তাঁর ছিল অদম্য আগ্রহ। গভীর রাতে বাড়ির সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, বেগম রোকেয়া তখন চুপিচুপি বিছানা ছেড়ে মোমবাতির আলোয় বড় ভাইয়ের কাছে বাংলা ও ইংরেজি বর্ণ শিক্ষা ও পাঠ গ্রহণ করতেন। এভাবেই পদে পদে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করে শিক্ষায় রোকেয়া ক্রমশ দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকেন। কী পরিমাণ ধৈর্য ও আগ্রহ থাকলে একজন মানুষ এত কঠিন সাধনা করতে পারে তা প্রতিটি বিবেকবান মানুষের জন্য বাংলার নারীদের সামনে আরো এগিয়ে যাওয়ার চিন্তার খোরাক।

১৮৯৮ সালে বেগম রোকেয়ার বিয়ে হয় বিহারের ভাগলপুর নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, উর্দুভাষী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সাথে। তিনি ছিলেন সমাজসচেতন, সামাজিক কুসংস্কারমুক্ত ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন। শিক্ষালাভ ও মূল্যবোধ

গঠনে বড় দুই ভাই ও বোন বেগম রোকেয়ার জীবনকে প্রভাবিত করলেও তাঁর প্রকৃত লেখাপড়া শুরু হয়েছিল বিয়ের পর স্বামীর সাহচর্যে। প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাখাওয়াত হোসেন রোকেয়ার লেখাপড়ার প্রতি অদম্য আগ্রহ ও উদ্দীপনা লক্ষ করে তাঁকে বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে তাঁর সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন। এর পাশাপাশি তাঁর লেখালেখিতেও সাহায্য করতে শুরু করলেন। স্বামীর কাছ থেকে ইংরেজিতে খুব ভালো দক্ষতা অর্জন করায় খুব সুন্দর ইংরেজি রচনা করতে পারতেন। বাংলা ভাষার প্রতি রোকেয়ার ছিল গভীর টান। তাই বাংলাতেই লেখালেখি শুরু করলেন।

শিক্ষিত-সজ্জন, উদার ও মুক্তমনের অধিকারী স্বামীর উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সহযোগিতায় বেগম রোকেয়া দেশি-বিদেশি লেখকদের রচনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে ক্রমশ ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। বিয়ের পর প্রগতিশীল স্বামীর সহযোগিতায় লব্ধ এই শিক্ষার ধারাই বেগম রোকেয়াকে সেসময়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবন, শিক্ষাহীন নারীসমাজের মুক্তির কথা ভাবিয়ে তোলে। অশিক্ষার অন্ধকার থেকে নারীদের কীভাবে আলোকিত করা যায়– এই ছিল তাঁর ভাবনা। এখান থেকেই স্বপ্ন দেখা শুরু করলেন একটি স্কুলের, যেখানে সমাজের পিছিয়ে পড়া নারী জনগোষ্ঠী লেখাপড়া শিখে অন্ধকারাচ্ছন্ন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন শিক্ষাহীন জীবন থেকে আলোকিত, মুক্তমনা, স্বাধীনচেতা আলোর দিশারি হয়ে সমাজের বুকে মাথা উঁচু হয়ে নিজেকে জানান দেবে– আমি শুধু নারী নই– আমি একজন মানুষ– আমার নিজস্ব মত প্রকাশের অধিকার আছে– আমি আমার মতন করে স্বাধীন ও সুন্দরভাবে বাঁচতে চাই। বেগম রোকেয়ার এ স্বপ্নকে আরো বিশাল করে তোলেন সাখাওয়াত হোসেন। এ থেকে দেখা যায়, বেগম রোকেয়ার জীবনে তাঁর স্বামীর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী এবং অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ। তাঁর সাহচর্যে এসেই বেগম রোকেয়ার জ্ঞানচর্চার পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে।

বেগম রোকেয়ার সাহিত্যচর্চার সূচনাও হয় স্বামীর অনুপ্রেরণায়। তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রকাশ ঘটে ১৯০২ সালে 'পিপাসা' নামে একটি বাংলা গল্প রচনা দিয়ে। প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে নবনূর পত্রিকায়। ১৯০৪ সালে রোকেয়ার প্রথম গ্রন্থ– প্রবন্ধ 'মতিচূর' প্রকাশিত হয়, যেখানে তাঁর নারীবাদী চিন্তা বিকশিত করেছেন। ১৯০৫ সালে ইংরেজিতে লিখেন 'সুলতানাস ড্রিম'। স্বামী সাখাওয়াত এই লেখাটি পড়ে বিহ্বল হয়ে বই আকারে প্রকাশের জন্য রোকেয়াকে উৎসাহিত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯০৮ সালে রোকেয়ার স্বামী জীবিত থাকা অবস্থায়ই 'সুলতানাস ড্রিম' প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে বাংলায় অনূদিত হয়ে 'সুলতানার স্বপ্ন' নামে প্রকাশিত হয়। 'সুলতানার স্বপ্ন' বইটিকে বিশ্বের নারীবাদী সাহিত্যে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই বইয়ে রোকেয়া তাঁর কল্পনায় এমন এক নারীসমাজব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে কোথায়ও কোনো পুরুষনির্ভর কাহিনির উল্লেখ নেই, পুরুষসমাজকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে, নারীরা বাইরের জগতে স্বাধীনভাবে নিশ্চিন্তে বিচরণ করছেন। ১৯২৪ সালে 'পদ্মরাগ' এবং ১৯৩১ সালে 'অবরোধবাসিনী' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হওয়ার আগে লেখাগুলো নবনূর, সওগাত, মোহাম্মদী, নবপ্রভা, মহিলা, ভারত মহিলা ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি নিয়মিতভাবে নবনূর, সওগাত, মোহাম্মদী, ভারত মহিলা, আল-এসলাম, নওরোজ, মাহেন ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, The Mussalman, Indian Ladies Magazine ইত্যাদি পত্রিকায় লিখতেন। রোকেয়ার সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে তৎকালীন নারীসমাজের প্রতিকূল অবস্থার চিত্র, সামাজিক কুসংস্কার ও অবরোধপ্রথার নেতিবাচক প্রভাব, নারী শিক্ষা প্রচলনে তাঁর প্রস্তাবনা, নারীর প্রতি চরম অবহেলা, নারী অধিকার, নারী উন্নয়ন ও নারীজাগরণ, লিঙ্গসমতা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রতিরোধ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা। এসব থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় যে শিক্ষা– তা তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার সংবলিত লেখনীর দ্বারা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

তিনি উপলব্ধি করেন, নারীকে মানুষ হিসেবে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রকৃত শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এই জন্য একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। স্বামী সাখাওয়াত এই জন্য তাঁকে দশ হাজার টাকাও দিয়েছিলেন। ১৯০৯ সালের ৩ মে বেগম রোকেয়ার স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন মারা যাওয়ার পর নিঃসঙ্গ রোকেয়া নারী শিক্ষার প্রসার ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৯০৯ সালের ১ অক্টোবর স্বামীর প্রদত্ত অর্থে পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' স্থাপন করেন। ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ কলকাতার একটি বাড়িতে মাত্র আটজন ছাত্রী নিয়ে নতুন করে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। বেগম রোকেয়া স্কুল পরিচালনায় প্রায় দুই যুগ তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। অসহনীয় বিরূপ সমালোচনাসহ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নানা কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে অতিক্রম করে এই স্কুলকে সেসময়ের মুসলমান মেয়েদের শিক্ষালাভের অন্যতম বিদ্যাপীঠে পরিণত করেন। এটিই ছিল তাঁর আদর্শ ও স্বপ্নের বাস্তবায়ন। তাই নারী শিক্ষার অগ্রদূত হিসেবে সমগ্র বাঙালির কাছে তিনি শ্রদ্ধেয়।

বাংলার নারী আন্দোলনে বেগম রোকেয়ার অবদান চিরস্মরণীয়। মুসলিম মেয়েদের সচেতনতা সৃষ্টিসহ তাদের অধিকার আদায়ে বেগম রোকেয়া ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম বা মুসলিম মহিলা সমিতি। এই সমিতির ইতিহাসের সাথে বেগম রোকেয়ার সংগ্রামী জীবনের কাহিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বহু বিধবা নারী এই সমিতি থেকে অর্থসহায়তা পেয়েছে, বহু দরিদ্র মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে, অনেক অভাবী মেয়ে সমিতির অর্থে শিক্ষালাভ করেছে, সমাজপরিত্যক্ত অসহায়-অনাথ শিশুরা আশ্রয় ও সাহায্য পেয়েছে। কলকাতার মুসলিম নারীসমাজের উত্তরোত্তর উন্নতির ইতিহাসে এই সমিতির অবদান উল্লেখযোগ্য। সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের অপবাদ মাথায় নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের অনুপ্রাণিত করেছেন।

১৯২৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বাংলার নারী শিক্ষাবিষয়ক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় মুসলিম সম্মেলনে বেগম রোকেয়া বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন– যা সে সময়ে ছিল দুঃসাহসিক কাজ।

২০০৪ সালে বিবিসি বাংলা আয়োজিত 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কে'– ত্রিশ দিনের এই শ্রোতা জরিপে মনোনীত শ্রেষ্ঠ বিশজন বাঙালির তালিকায় ষষ্ঠস্থান অর্জন করেন বেগম রোকেয়া।

নারীজাগরণের অগ্রদূত এই মহীয়সী নারী ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর মাত্র ৫২ বছর বয়সে কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি নারীজাগরণ, নারী শিক্ষা, নারী উন্নয়নের অগ্রদূত, বাঙালি মুসলিম নারীজাগরণের অগ্রদূত এবং প্রথম বাঙালি নারীবাদী বাঙালি চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক, সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কারক মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সংগ্রামী কর্মময় জীবন ও সার্বিক নারী উন্নয়নে তাঁর কর্মকৌশল সম্পর্কে উপরের বর্ণনায় জানা যায় বেগম রোকেয়ার সময়কালীন– ক) বাংলার নারীদের প্রতি চরম অবহেলা, খ) নারী সমাজের প্রতিকূল অবস্থা, গ) সামাজিক কুসংস্কার ও অবরোধ প্রথার নেতিবাচক প্রভাব, ঘ) নারী শিক্ষা-জ্ঞান চর্চার দুরবস্থা, ঙ) স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে না পারা, চ) স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে না পারার চিত্রসহ নারীদের আরও নানা ধরনের অসহায়ত্বের চিত্র। বড় হওয়ার সাথে সাথে বিষয়গুলোতে তাঁর মনে দাগ কাটতে থাকে। এগুলো তাঁর বেমানান, বৈষম্যমূলক, বিমাতাসুলভ আচরণ মনে হওয়ায় এ থেকে উত্তরণে সময়ের সাথে সাথে মনে মনে উপায় খুঁজতে থাকেন। একসময় তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনিত হন- এ থেকে উত্তরণে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তারপর অসীম ধৈর্যের সাথে বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে, বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলে বলীয়ান হয়ে তিনি বাংলাদেশ তথা সমগ্র বাংলা ভারতীয় উপমহাদেশের নারীদের জাগিয়ে তুলে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসার যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন– তার জন্য বিশেষত বাংলাভাষী সবার কাছে অনুকরণীয় হয়ে আছেন এবং থাকবেন। তাই তো তিনি বাংলার নারীজাগরণ ও নারী শিক্ষার অগ্রদূত হিসেবে সবার মনের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছেন। সেই সময়ে সকল ধরনের বিদ্রুপ উপেক্ষা করে এই অসাধ্য কার্যসাধনের মাধ্যমে নারী জাতিকে কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে শৃঙ্খল মুক্ত করে যে জ্বলন্ত উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন– তাঁর এই অসামান্য অবদান পৃথিবী যতদিন থাকবে, বাঙালি জাতি ততদিন তা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

স্বাধীনতার আগে বাঙালি নারীরা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পিছিয়ে থেকে কুসংস্কারে আচ্ছাদিত ছিল। নারীকে অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর প্রজ্ঞা, মেধা ও দূরদর্শিতা দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক এই নারী জনগোষ্ঠীকে সার্বিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে পারলেই কেবল কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব। সে লক্ষ্যে নারী উন্নয়নে সরকারের টেকসই, যুগোপযোগী পদক্ষেপের ফলে বেশিরভাগ নারী নিজেকে স্বাবলম্বী করতে পেরেছেন। সুশিক্ষা ও স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নারীরা স্বাধীন মত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হচ্ছেন, সকল প্রকার বৈষম্য ও নির্যাতন দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করছেন, প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে অধিকার আদায় করছেন, কর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের সমান যোগ্যতা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারছেন।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর দূরদর্শী, সুদক্ষ ও সাহসী নেতৃত্ব এবং নারীকে শিক্ষিতকরণের মাধ্যমে উন্নয়নের সব ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমঅধিকার নিশ্চিতের ফলে বাংলাদেশ আজ বিশ্বদরবারে উন্নয়নের রোল মডেল।

বাঙালি জাতি হিসেবে বেগম রোকেয়া দিবসে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো– বাঙালি নারীজাগরণ, নারী শিক্ষা, নারী উন্নয়নের অগ্রদূত– এই মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ও তাঁর আদর্শকে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়ার কার্যকর ও বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করা, যার ফলে বাংলার নারীরা তাঁর আদর্শকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে উন্নতির আরো উচ্চশিখরে পৌঁছাতে পারেন এবং এটাই হবে বেগম রোকেয়ার প্রতি সম্মান দেখানো। এতেই তাঁর পরিশ্রম সার্থক হবে– তাঁর বিদেহী আত্মা চিরশান্তি পাবে।

বেগম রোকেয়া যে দীপ্ত, সাহসী ও দৃঢ়চেতা মনোভাব নিয়ে সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে নারীদের জাগরিত করে প্রকৃত শিক্ষালাভের সুযোগ করে দিয়ে সার্বিক উন্নয়নের স্রোতধারায় নিয়ে এসেছিলেন, বাংলাদেশের সংগ্রামী নারীগণ তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে তাঁদেরকেও যেসব ক্ষেত্রে বাধাবিপত্তি আসবে, সেসব ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী সময়োপযোগী কার্যকর কৌশল অবলম্বন করে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করবে–এই হোক আজকের দিনে আমাদের সকলের প্রত্যাশা।

লেখক : গবেষক ও প্রাবন্ধিক

বেগম রোকেয়া ও নারী উন্নয়ন

ড. শেখ মুসলিমা মুন

বেগম রোকেয়া। নারীজাগরণের অগ্রদূত। ১৮৮০ সালে জন্ম নেন এই মহীয়সী নারী। পারিবারিক নাম রোকেয়া খাতুন। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বা মিসেস আর এস নামে তিনি লেখালেখি করতেন। কালের বিবর্তনে তিনি আজ বেগম রোকেয়া; বাংলার নারীজাগরণের অগ্রদূত। তিনি নারী স্বাধীনতা ও নারীর উন্নয়নের স্বপ্নদ্রষ্টা। শতবর্ষ আগে তিনি যেসব স্বপ্ন দেখেছিলেন তা আজও সমানভাবে সমসাময়িক। রোকেয়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়ে নতুন উন্নত এক বাংলাদেশকে বিশ্বের সামনে হাজির করেছেন বাংলাদেশের ভিশনারি লিডার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের নারীসমাজের কাছে তিনি বর্তমানের বেগম রোকেয়া। তিনি আজ বেগম রোকেয়ার স্বপ্নসারথি হয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন দেশ তথা বাংলার নারীসমাজকে।

দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। সেই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে পশ্চাৎপদ রেখে কোনো দেশ বা সমাজ উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তো একশত বছরের বেশি সময় আগেই বেগম রোকেয়া বলেছিলেন, 'আমরা সমাজের অর্ধাঙ্গ, আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কী ভাবে?' তিনি সমাজের পুরুষ-নারীকে মানবদেহের একটি শরীরের সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন, 'কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে?' পুরুষ-নারীকে সর্বক্ষেত্রে সমানতালে সমান যোগ্যতায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য পুরুষ-নারীকে সমাজের দুটি চক্ষুর সাথে তুলনা করে বলেছেন, 'মানুষের সবরকম কার্যক্রমের প্রয়োজনে দুটি চক্ষুর গুরুত্ব সমান।' নারী পুরুষ ভেদে মানুষ শরীরে তার হাত, পা, চক্ষু, মেধা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে তাই তাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ভিন্ন হওয়ার কথা নয়। তাই তো তিনি যুক্তি দিয়ে নারীকে অনুপ্রাণিত করতে বলেছেন, 'পুরুষের স্বার্থ ও আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্য যাহা আমাদের (নারীদের) লক্ষ্য তাহাই।'

একইভাবে তিনি নারীর উন্নয়ন তথা নারী-পুরুষের সমান অধিকার অর্জনে ও সমাজ গঠনে উভয়ের অবদান রাখার বিষয়ে গভীর দৃষ্টিপাত করেছেন। তিনি নারী-পুরুষকে একটি গাড়ির দুটি চাকার সাথে তুলনা করে বলেছেন, 'যে শকটের একটি চক্র বড় (পতি) এবং এক চক্র ছোট (পত্নী), সে শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না।' অর্থাৎ, সমাজ উন্নয়নের চাকা পুরুষ-নারী উভয়ই। তাই পুরুষ-নারী উভয়েই সমান সক্ষমতার না হলে সেই সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

বেগম রোকেয়া নারী জাতিকে সামাজিক অবরুদ্ধতা, অনগ্রসরতার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে সর্বদা অনুপ্রাণিত করেছেন। নারীদেরকে মুক্ত হওয়ার জন্য আবেগমথিত আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি অবরুদ্ধ নারীসমাজকে পর্দার অন্তরাল থেকে বা অন্দরমহলের অবগুণ্ঠন থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'ভগিনীরা চোখ রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন– অগ্রসর হউন! মাথা ঠুকিয়া বলুন মা! আমরা পণ্য নই: বলো ভগিনী; আমরা আসবাব নই; বলো কন্যে আমরা জড়োয়া অলঙ্কার রূপে লোহার সিন্দুকে থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বলো, আমরা মানুষ"। তাই তো বেগম রোকেয়া বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন, 'কন্যারা জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত দেশমাতৃকার উন্নয়ন সম্ভব না।' অর্থাৎ, তিনি বলতে চেয়েছেন সমাজের কুপ্রথার বিরুদ্ধে জেগে উঠে নারী তার নিজের অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাক। নিজেকে শুধু নারী নয়, নিজেকে মানুষরূপে পরিচিত করুক। পুরুষ যদি সমাজে তার পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে পারে, জীবনকে স্বাধীনভাবে উপভোগ করতে পারে, সমাজে অবদান রাখতে পারে, তবে নারী কেন পারবে না? শুধু নারী হওয়ার অপরাধে তাদেরকে সমাজের কুপ্রথার শিকার হয়ে ঘরের ভিতর আবদ্ধ থেকে বা পর্দার অন্তরালে থেকে ঘরোয়া গহনায় সজ্জিত হয়ে অলংকারস্বরূপ বা আসবাবের মতো বসবাস করবার জন্যই তাদের জন্ম হয়নি। তারাও অংশ নিক সমাজের

সর্বকাজে, উপভোগ করুক মানবজীবনের সবকিছু, অবদান রাখুক পরিবার, সমাজ এবং দেশ গঠনে।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন, 'না জাগিলে ভারত ললনা এ ভারত আর জাগিবে না।' অর্থাৎ, নারীজাগরণের ওপর নির্ভর করে সমস্ত ভারতবাসীর উন্নয়ন বা কল্যাণ। যা আজও একইভাবে প্রযোজ্য বাংলাদেশসহ সকল দেশে, সব সমাজে। আশার কথা এই যে, বর্তমানে বাংলাদেশের নারীরা জেগেছে, ২০২২-এর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের জেন্ডার বৈষম্য প্রতিবেদনে তাই আজ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষে আর ১৪৬টি দেশের মধ্যে ৭১তম।

আর এই অর্জনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, যাঁর নেতৃত্বে শিরদাঁড়া উঁচু করে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের নারীসমাজ। শতবর্ষ আগে বেগম রোকেয়া বলেছিলেন, 'আমরা উপার্জন করি না কেন? আমাদের কি হাত নাই, পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কী নাই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকাজে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসা করিতে পারিব না?' অর্থাৎ, গৃহকর্মের পাশাপাশি নারীর উপার্জনমুখী উৎপাদনশীল স্বাধীন কাজের কথাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি, যা একাধারে নারীর ক্ষমতায়নকে নির্দেশ করে এবং একই সাথে নারীমুক্তির প্রেরণা জোগায়।

নারীসমাজকে উৎপাদনে উপার্জনে সক্রিয় করার রোকেয়ার মন্ত্র বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী উদ্যোগে প্রতিফলিত হতে দেখা যাচ্ছে। তিনি ইতোমধ্যে ২০৪১ সালের মধ্যে নারীর গৃহকর্মীর পাশাপাশি উপার্জনমুখী কর্মের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে গুরুত্ব দিয়েছেন। ফোর্থ ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন উইমেনের ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম বার্ষিক অধিবেশনে বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ৫০-৫০এ উন্নীত করার অঙ্গীকার করেছেন।

পাশাপাশি বাল্যবিবাহ যেহেতু বর্তমান সমাজে নারী উন্নয়নের একটি বড় বাধা, তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও নির্মূল করতে নানা কার্যকর আইন ও নীতিমালা গ্রহণ করেছেন। সেই সাথে তিনি নারীর সমতা, ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। শতবর্ষ আগে বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষার বহুল প্রচার ও বাল্যবিবাহ রহিত করতে যেমন বলেছিলেন, 'মেয়েদের বেশী করে পড়া লেখা শিখতে হবে, যাতে তারা নিজের শরীরের যত্ন করতে শেখে; আর অল্প বয়সের ছেলে-মেয়ের বিয়ে বন্ধ করতে হবে।'

যদিও বাংলাদেশে নারীসমাজ এগিয়ে যাচ্ছে, তবুও এর আরো দ্রুত গতিশীলতা প্রয়োজন। এখনো যেতে হবে অনেক দূর। রাতারাতি সামাজিক নিয়ম কানুন, কুপ্রথা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রথার ভুল ব্যাখ্যা, সামাজিক ট্যাবু দূর করা সম্ভব নয়। এখনো সমাজের স্বার্থান্বেষী ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীর বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করার প্রবণতা দেখায় । এ প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়া বলেছিলেন, 'যখনই কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনি ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে।' এরূপ প্রবণতা কেবল বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান।

তবে আমরা খুবই আশাবাদী এ যুগের বেগম রোকেয়া স্বপ্নদ্রষ্টা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দ্রুতই বিলুপ্ত হবে নারীর প্রতি সব ধরনের সামাজিক বৈষম্য ও সহিংসতা। প্রতিষ্ঠিত হবে নারী-পুরুষের সাম্যতাভিত্তিক সমাজ। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবে রূপ পাবে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে।

জয় বাংলা।

লেখক : জেন্ডার বিশেষজ্ঞ ও উপসচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

‘আপনি শক্তির নাম, গৌরবের উৎস- বেগম রোকেয়া’

নাসিমা আক্তার নিশা

বাংলাদেশের নারীদের এগিয়ে আসার পেছনে আমাদের অনুপ্রেরণার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বেগম রোকেয়াকে নানা কারণে স্মরণ করতেই হবে। তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি দিতে প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। তাঁকে নিয়ে বিবিসি বাংলাকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কেতকী কুশারী ডাইসন বলেছেন, ‘বাংলার নবজাগরণের মতো বড় একটা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছিলেন বেগম রোকেয়া, কিন্তু নারীমুক্তির বাস্তব পথ দেখাতে তাঁর অবদান ছিল বিশাল। তাঁর অর্জনের পেছনেও নবজাগরণ নিঃসন্দেহে একটা বড় প্রেরণা ছিল। কিন্তু সে সময় আরো অনেকে হয়তো একইভাবে ভাবছিলেন, একই ধরনের কর্মে আত্মনিবেদন করেছিলেন। কিন্তু বেগম রোকেয়ার যে কাজটা সবার থেকে আলাদা হয়ে উঠেছিল তা হলো মেয়েদের শিক্ষার জন্য তাঁর সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠা, যেটা ছিল নারী শিক্ষার পথে একটা বড় অবদান। ‘ব্যক্তি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মানে আমাদের রোকেয়া একাধারে নানা গুণের এক আধার ছিলেন। তিনি একাধারে ছিলেন চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কারক। তিনি বাঙালি মুসলিম নারীজাগরণের অগ্রদূত এবং প্রথম বাঙালি নারীবাদীও বটে।

বেগম রোকেয়ার পূর্বপুরুষগণ মুঘল আমলে উচ্চ সামরিক এবং বিচার বিভাগীয় পদে নিয়োজিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর কার্যক্রমে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সমাজের অনেক প্রচলিত রীতিনীতি মেনেই তাঁর কর্মযজ্ঞ চালিয়ে ছিলেন তিনি, কিন্তু সেই সময়েই তিনি নারীর স্বাধীনতাই নয়, সার্বিক মুক্তির কথা চিন্তা করেছেন। বাঙালি মুসলমান সমাজে রোকেয়াই সর্বপ্রথম শিক্ষা বিস্তারকে নারীমুক্তি ও প্রগতির বৃহত্তর অভিযাত্রার সাথে যুক্ত করেন। তাঁর সমাজ-ভাবনা মূলত নারীমুক্তি ভাবনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীর প্রতি যে নিষ্ঠুরতা ও অবিচার তার বিরুদ্ধে ছিল রোকেয়ার আপসহীন সংগ্রাম। আর এ সামাজিক উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হিসেবে তিনি শিক্ষাকেই প্রধান মাধ্যম ভেবেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মত হলো, ‘শিক্ষাবিস্তারই এই সব অত্যাচার নিবারণের একমাত্র মহৌষধ। শিক্ষা বলতে তিনি এমন শিক্ষাকে বুঝিয়েছেন, যা নারীদের মধ্যে আপন অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগাবে।

রোকেয়া একদিকে যেমন শিক্ষাকে চাকরি লাভের উপায় হিসেবে দেখেননি, তেমনি তিনি ‘শিক্ষা’ ও অর্থ কোনো সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের অন্ধ অনুকরণকেও প্রকৃত শিক্ষা হিসেবে চিহ্নিত করেননি। তাঁর কাছে শিক্ষা হলো– ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করা। তিনি আরো বলেন, ‘ঐ গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ। ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মন এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, চক্ষু দ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন (observe) করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগ (attention) পূর্বক শ্রবণ করি এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি– তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।’ তিনি সুস্পষ্ট করেন,’ আমরা কেবল ‘পাশ করা বিদ্যাকে প্রকৃত শিক্ষা বলি না।’

সুতরাং এ কথা বলাই বাহুল্য যে, বেগম রোকেয়া নারীসমাজের মুক্তির জন্য এ ধরনের শিক্ষা ভাবনা থেকেই তিনি ‘সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রোকেয়ার সমাজ ভাবনার কেন্দ্রে ছিল নারীর অধিকারবোধ প্রতিষ্ঠা করা।

তিনি নারীদের পুরুষের পাশাপাশি পরিবার, সমাজে ভূমিকা রাখতেও আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, ‘যদি বলি, আমরা দুর্বলভূজা, মূর্খ, হীনবুদ্ধি নারী। সে দোষ কাহার? আমাদের। আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে

বাহুলতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না? এখন একবার জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া দেখি ত এ অনুর্বর মস্তিষ্ক সুতীক্ষ্ণ হয় কি না!'

আজকের বাংলাদেশে ঘরে ঘরে নারীদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে রোকেয়ায় এ আহ্বান এক অদম্য অনুপ্রেরণা জোগায়। কেবল তাই নয়, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, পারিবারিক স্বাস্থ্য রক্ষা ও পুষ্টিবিজ্ঞানে তাঁর ছিল অগাধ জ্ঞান।

'সুগৃহিণী' প্রবন্ধে তিনি সেসব নারীকেই রুচিশীল হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন, যারা স্বল্পশ্রম, ব্যয় ও সময়ে ঘরকন্নার কাজ নিপুণভাবে করতে পারে। তিনি মনে করতেন, সুগৃহিণী হতে হলেও সুশিক্ষা আবশ্যক। 'মতিচূর' বইয়ের 'গৃহ' প্রবন্ধে তিনি ঘরকে মানুষের শারীরিক আরাম ও মানসিক শান্তিনিকেতন হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, 'আমাদের সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, অধিকাংশ ভারত নারী গৃহসুখ বঞ্চিতা। যাহারা অপরের অধীনে থাকে, অভিভাবকের বাড়িকে আপন ভবন মনে করিতে যাহাদের অধিকার নাই, গৃহ তাহাদের নিকট কারাগারতুল্য বোধ হয়।' কারণ তাঁর ভাষায়, 'কেবল চারি প্রাচীরের ভিতর থাকিলেই গৃহে থাকা হয় না।' পারিবারিক জীবনে অসুখী ব্যক্তির কাছে গৃহ কখনোই শান্তিনিকেতন বলে মনে হয় না। গৃহকে শান্তিময় করতে হলে আসলে নারীদের গৃহে যেমন অধিকার থাকতে হবে, তেমনি পারিবারিক জীবন সুন্দরভাবে চালাবার জন্য নারীদের সুশিক্ষিত হতে হবে।

এমনকি রোকেয়া বলেছেন, সন্তান পালনের নিমিত্ত বিদ্যা বুদ্ধি চাই, যেহেতু মাতাই আমাদের প্রথম, প্রধান ও প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী। সেই সাথে তিনি সন্তানের সুস্বাস্থ্যেও শর্ত হিসেবে মাতার সুস্বাস্থ্যের ওপর জোর দিয়েছেন। রোকেয়ার ভাষায়, 'হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ পুত্র লাভ করিতে হইলে প্রথমে মাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইবে।'

সন্তান সুপ্রতিপালনকে রোকেয়া অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। 'সুগৃহিণী' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, সন্তান পালনের সঙ্গে সঙ্গেই সন্তানের শিক্ষা হইয়া থাকে। একজন ডাক্তার বলিয়াছেন যে, 'মাতা হইবার পূর্বেই সন্তান পালনের শিক্ষা করা উচিত। মাতৃকর্তব্য অবগত না হইয়া যেন কেহ মাতা না হন।'

রোকেয়া সে সময়েও কন্যাশিশুদের অপরিণত বয়সে বিয়ের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যে বেচারীকে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে মাতা, ছাব্বিশ বৎসর বয়সে মাতামহী এবং চল্লিশ বৎসর বয়সে প্রমাতামহী হইতে হয়, সে মাতৃজীবনের কর্তব্য কখন শিখিবে?' আর এজন্যই রোকেয়া তাঁর সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা মানুষ।

বিগত বছরগুলোর মতো ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া দিবসকে ঘিরে ব্যাপক আঙ্গিকে প্রচার ও প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি মহোদয়কে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আজ বাংলাদেশের নারী জাতির সুযোগ্য প্রতিনিধি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যোগ্যতার সাথে দেশ পরিচালনা করছেন। এ যেন রোকেয়ার স্বপ্নের অন্যতম সফল বাস্তবায়ন। রোকেয়া চেয়েছিলেন নারীরা দেশ পরিচালনা করুক, নিজের মেধার স্বাক্ষর রাখুক। অর্থনৈতিকভাবে উন্নত অন্যান্য দেশের চেয়ে সুযোগ্য নারী নেতৃত্বের দিক থেকে বাংলাদেশ কেবল এগিয়েছে তাই নয়, বরং বলা চলে এক মাইলফলক স্থাপন করেছে। এমনকি করোনাকালে বিশ্ব অর্থনীতি যখন পর্যুদস্ত তখন রোকেয়ার উত্তরসূরি এদেশের নারীরা ঘরে বসেই অনলাইনে নিজ নিজ পরিবার ও দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। আর এ সবই সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নারীবান্ধব পলিসি ও নেতৃত্বের কারণেই।

বেগম রোকেয়া ছিলেন একজন উঁচুমানের সমাজসংস্কারক। তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন আমাদের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা। বঙ্গবন্ধুর কারাবন্দিকালে সমাজের অগ্রযাত্রার মিছিলের পিছিয়ে পড়া বাঙালিদের এগিয়ে যেতে মশাল হাতে এগিয়ে দিয়েছিলেন বঙ্গমাতা।

পরিশেষে বলতে চাই, আমাদের সকল কাজের এই যাত্রায় বেগম রোকেয়ার মতো মহীয়সী নারী অনুপ্রেরণার এক বিশাল উৎস। রোকেয়ার লেখায়, কাজে চিন্তার অনেক কিছুর প্রতিফলন আমাদের বর্তমান নারীদের নানা কাজের মাঝে খুঁজে পাই। সেজন্য গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা আপনার প্রতি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।

লেখক: প্রেসিডেন্ট, ওমেন অ্যান্ড ই-কমার্স ফোরাম (উই)

বেগম রোকেয়ার স্বপ্নের প্রজাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ড. মাহবুবা রহমান

বেগম রোকেয়ার জন্ম হয় এমন এক সময়ে, যখন গোটা ভারতীয় উপমহাদেশ ছিল নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। আর এসব কুসংস্কারের বিরাট অংশ ছিল নারী সমাজকে ঘিরে। নারীশিক্ষা, নারীদের ঘর থেকে প্রয়োজনে বের হওয়া ও সমাজের নানান কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ ইত্যাদিকে পাপ মনে করা হতো। অথচ ইসলাম নারী-পুরুষ সকলের জন্য জ্ঞানার্জনকে অত্যাবশ্যকীয় করেছে এবং শালিনতা বজায় রেখে প্রয়োজনে সামাজিক ও পেশাগত কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণকে সম্পূর্ণ অনুমোদন করেছে।

কাজেই আজকের যুগে অবস্থান করে বেগম রোকেয়ার অবদানকে উপলব্ধি করতে হলে, আজ থেকে একশত বছরেরও বেশি সময় আগের সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান কোথায় ছিল, তা ভালো করে বুঝতে হবে। বেগম রোকেয়া ছিলেন নারী-শিক্ষার অগ্রদূত। তবে তৎকালীন মুসলিম সমাজে নারী-শিক্ষার পক্ষে কথা বলা ছিল রীতিমতো ভয়াবহ ব্যাপার। তবুও তিনি নারীশিক্ষার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

সেই সময় বেগম রোকেয়া সত্যিকার অর্থে একজন ইসলামী চিন্তাবিদ, সমাজসংস্কারক ও মহৎ শিক্ষাবিদের দায়িত্ব পালন করেন। তার সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে, মুসলিম মহিলাদেরকে কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে আলোতে টেনে আনা, যাকে ইসলামের মূল শিক্ষা বলে মনে করা হয়।

তাই আমরা দেখতে পাই বেগম রোকেয়া তাঁর লেখনিতে নারী-পুরুষকে ইসলামের মৌল ধারার দিকে নিয়ে আসার জন্য আহ্বান করেছেন। তিনি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন কীভাবে ধর্মকে হৃদয়ে ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে। তাঁর লেখনি দেখে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি প্রচণ্ড আল্লাহভক্ত এবং ইসলামের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল রমনী ছিলেন। অবরোধ-বাসিনীতে আমরা দেখতে পাই, তিনি বিভিন্ন স্থানে মহান রাব্বুল আলামীনকে অত্যন্ত সম্মানজনক ভাষায় স্মরণ করেছেন; দুর্দশাগ্রস্থ নারী সমাজের মুক্তির জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন ছিল বাংলার নারীদেরকে শিক্ষিত করে তোলা এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা।

তাই তাঁর প্রবন্ধ, গল্প ও উপন্যাসের মধ্য দিয়ে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের কথা উঠে এসেছে।

বেগম রোকেয়া আজ থেকে শত বছর পূর্বে তাঁর নারীস্থানে শাসন কার্যপরিচালনায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎকর্ষতা অর্জন ও প্রসারণে যে দৃঢ়চেতা নারী শাসকের স্বপ্ন দেখেছিলেন, বাস্তবে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার কার্যক্রম নারীর ক্ষমতায়নে সে স্বপ্নের অতিক্রমণ ঘটেছে। নারীর ক্ষমতায়নের স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে বহুদূর।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী পদক্ষেপ বাংলাদেশকে বিশ্ব-মাঝে একটি উন্নত দেশ হিসেবে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে। তাই বাংলাদেশকে বলা হয় তৃতীয় বিশ্বের আদর্শ মডেল। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের জন্য মুখে অন্ন, পরনে বস্ত্র, আশ্রয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন প্রতিষ্ঠা করা।

'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া বলেন, "পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী-কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী-ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী-ব্যারিস্টার, লেডী-জজ সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী Viceroy হইয়া এ দেশের সমস্ত নারীকে "রানী" করিয়া ফেলিব, উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা 'স্বামী'র গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না? আমরা যদি রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। ভারতে বর দূর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারী-জাগরণ, নারীঅধিকার প্রতিষ্ঠার কার্যকর মানবী, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যার করুণার হাত মানবতার জন্য দৃঢ় প্রসারিত। যার সাহসী সিদ্ধান্তে নারীমুক্তির অগ্রগতিই শুধু নয়, কার্যকর হয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন, সকল ক্ষেত্রে বেড়েছে নারীর সম্মান ও মর্যাদা। তাই আজ আমরা রাষ্ট্রীয় জীবনে দেখতে পাই নারীর জয় জয়কার। রাষ্ট্রে সকল ধরণের চাকুরিতে নারী আজ অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন।

রাষ্ট্র পরিচালনায় বাংলাদেশকে প্রায় তিন (০৩) দশক ধরে নারীরাই নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যার ফলস্বরূপ আজ আমরা দেখতে পাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদের সদস্যসহ ৭০ জন নারী সংসদ সদস্যকে। এছাড়া সিটি কর্পোরেশনের মেয়র থেকে শুরু করে জেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ সর্বত্রই নারী জনপ্রতিনিধি বিরাজমান। বর্তমানে নারীগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই শিক্ষালাভের পাশাপাশি বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পেশায় নিয়োজিত থেকে সাফল্য অর্জন করছেন। একদিকে বিচার বিভাগে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের এ্যাপিলিয়েট বিভাগে নারী বিচারপতি কর্মরত রয়েছেন, তেমনি নির্বাহী বিভাগে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর, বিভিন্ন সংস্থা প্রধান, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পেশাসহ সকল ধরণের চাকুরিতে নারী আজ অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০০ সালে প্রথম সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে নারী কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছেন। সেই থেকে নারী সামরিক কর্মকর্তা তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। এমনকি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনেও তিন বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের নারী সদস্য নিয়োজিত থেকে বিদেশের মাটিতে গৌরবোজ্জ্বল অবদান রাখছেন। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে রাজনীতিতে এবং বিভিন্ন পেশায় নারীর প্রবেশের ফলে রাষ্ট্র পরিচালনা ও কর্মসংস্থনের ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়ার ভাবনার অতিক্রমণ ঘটেছে।

বাংলাদেশের নারী-মেধা ও প্রতিভা বিকাশের সাধনায়, শ্রমশক্তি ও দক্ষতার যোগ্যতায় মমত্ব ও আন্তরিকতায় নারীত্বের মর্যাদায় মানবিক। বাংলাদেশের আজকের সুশিক্ষিত বাঙ্গালী নারী-সমাজে যারা সুগৃহিনী, সুনাগরিক, সফল জননী, তারাই বেগম রোকেয়ার স্বপ্নচিন্তার ধারাবাহিক বাস্তবায়নকারী। বেগম রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি শুধু যে নারীশিক্ষার জন্যই চেষ্টা করে গেছেন, নারীকে জাগাতে চেয়েছেন, এমনটিই নয়। তিনি অনেক সুন্দর একটি দেশের কল্পনা করে গেছেন। স্বপ্ন বুনে গেছেন, যেখানে কোনো অকালমৃত্যু হবে না। যেখানে মানুষ, 'নারী-পুরুষ' হিসেবে নয়, দু'জনেই মানুষ হিসেবে কাজ করবে। কেউ কাউকে অবমূল্যায়ন করবে না। যার যার জায়গা থেকে কাজ করবে। শারীরিক শক্তি এবং বুদ্ধিমত্তা দু'টিকেই কাজে লাগিয়ে একটি দেশকে কীভাবে সুখের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করা যায়, সেই স্বপ্ন রচনা করে গেছেন। কার্যতঃ এই 'সুলতানার স্বপ্ন' কল্পকাহিনীটিকে আমরা আধুনিক 'সায়েন্স ফিকশনের' সাথে তুলনা করতে পারি। কারণ, বেগম রোকেয়া যুগের চেয়ে অনেক বেশি বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন, আধুনিক চিন্তাশীল ছিলেন। তিনি সেই সময়েই সৌররশ্মির ব্যবহার করে সংসারের দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করার কথা চিন্তা করতে পেরেছেন। সৌর রশ্মিকে যুদ্ধে জেতার জন্য অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার পাশাপাশি মাঠের ফসল

ফলানোর কাজে ব্যবহারের চিন্তা করেছেন। বৃষ্টির পানিকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রয়োজন মতো ব্যবহারের চিন্তা করেছেন। বর্তমান বিশ্বে, ঠিকই সৌররশ্মির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। বৃষ্টির পানিকে নিয়ন্ত্রণ করে আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করতে পারলে আমাদের বৈদ্যুতিক যে চাহিদা আছে, বিদ্যুতের যে অভাব আছে, তার অনেকটাই আমরা নিরসন করতে পারি। একজন নারী হয়ে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষা লাভ না করেও নিজের চেষ্টায়, নিজের চিন্তা-চেতনা দিয়ে নিজেকে তিনি প্রস্তুত করতে পেরেছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ প্রণয়ন এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নিরাপদ ও উন্নত জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর বাস্তবায়নও হচ্ছে। তিনি ইতোমধ্যে ২০২১ সালের রূপকল্প, ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ এবং ২১০০ সালের ডেল্টা প্ল্যান তৈরি করেছেন। ভবিষ্যতের বাংলাদেশ কেমন হবে; কেমন করে এগিয়ে যাবে, কেমন করে নেতৃত্ব দেবে; তিনি সে স্বপ্ন রচনা করে যাচ্ছেন। পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দিয়েছেন বাস্তবায়নের জন্য। একুশ শতকের বাংলাদেশকে তুলে দিয়েছেন আগামী প্রজন্মের হাতে।

বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এখন প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ ঘটছে বাংলাদেশে। যার ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন এখন প্রজাপতির পাখায় পাখায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ পরিচালনায় সুশাসন, কৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নয়নে গতিশীলতা, শিশুস্বাস্থ্য সুরক্ষা, শিশুশ্রম রোধ, শিশুবিকাশের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে কঠোর আইন প্রণয়ন, নারীর দক্ষতা অর্জনে এবং নারীর ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃজন, খাদ্য নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, সর্বত্রই এই প্রজাপতির কর্মবিচরণ-শক্তি।

তাই এই সব স্বপ্নের বাস্তবায়নে যে মানবাধিকার ও নিরাপত্তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, সেই স্বপ্নদ্রষ্টা প্রজাপতির নাম শেখ হাসিনা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদরের কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-প্রজন্মের কিংবদন্তী।

সবশেষে বলব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত্ব পালনে আজ এক অনন্য অভিভাবকে পরিণত হয়েছেন। আন্তর্জাতিকভাবেও তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং শান্তি ও মানবতার সংগ্রাম বিপুলভাবে প্রশংসিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা আজ দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলার নারীদের উন্নয়ন নিয়ে বেগম রোকেয়ার যে স্বপ্ন ছিল, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ বির্নিমাণে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। আমরা আশা করি, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপর তাওয়াক্কুল করে বেগম রোকেয়ার কর্ম ও আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আজকের নারীরা জাতির পিতার স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাবেন-ইন্‌শাআল্লাহ্‌।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, লালমাটিয়া সরকারী মহিলা কলেজ, ঢাকা

নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনে বেগম রোকেয়া

মফিদা বেগম

আজ থেকে প্রায় ১২৫ বছর আগে বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রে নারীদের ভোটাধিকার বলে কোনো অধিকার ছিল না। ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলার নারীসমাজের চিত্র ছিল আরো ভয়াবহ। পুরুষশাসিত সমাজে বাস করেও বেগম রোকেয়া ভারতবর্ষের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীসমাজের প্রগতি, নারী শিক্ষা বিস্তার, নারীর অধিকার রক্ষা আন্দোলন এবং নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনে আজীবন কাজ করেছেন।

রোকেয়া সমগ্র জীবন নারীর মানবাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করেছেন। তিনি নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেছেন, আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন, সাহিত্যচর্চা করেছেন, ভোটাধিকার অর্জনের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজ করেছেন, ভোটাধিকার আন্দোলনের কমিটির অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে ইংরেজ সরকারের মন্টেগু চেমসফোর্ড কমিটির কাছে নারীর ভোটাধিকার দাবি পেশ করেছেন।

রোকেয়ার স্বশিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের ও বড় বোন করিমুন্নেসার ভূমিকা এবং স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের প্রণোদনার কথা আমরা জানি; কিন্তু এর পেছনে রোকেয়ার শ্রমসাধ্য অনুশীলন, বিদ্যাচর্চার ধারাবাহিকতার সোপান তিনি কীভাবে অতিক্রম করেছেন সে বিষয়ে আমরা সামান্যই জানি। এমনিভাবে রোকেয়ার সাহিত্যচর্চা ও শিক্ষানুরাগী ভূমিকার বাইরে নারীর মানবাধিকার আন্দোলনে রোকেয়ার সম্পৃক্ততা ও ভূমিকার বিষয়টি আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে রয়ে গেছে। অনালোচিত রয়ে গেছে ভারতবর্ষে নারীর ভোটাধিকারের আন্দোলনের সাথে রোকেয়ার তাৎপর্যময় ভূমিকার বিষয়টি। এমনকি রোকেয়ার জীবন নিয়ে যাঁরা বিভিন্নভাবে গবেষণা বা বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁদের লেখাতেও প্রসঙ্গটি অনুল্লিখিত রয়ে গেছে।

ভারতীয় নারীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডবিষয়ক গবেষক বারবারা সাউথার্ডের 'দি উইমেন্স মুভমেন্ট অ্যান্ড কলোনিয়াল পলিটিক্স ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে রোকেয়ার রাজনৈতিক ভূমিকা বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। গ্রন্থটিতে ১৯২১ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সময়ের ভারতীয় নারীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে রোকেয়া সম্পর্কিত যেসব তথ্য উত্থাপিত হয়েছে, তাতে উপলব্ধি করা যায় নারীর ভোটাধিকারের প্রশ্নে উনবিংশ শতকের বিশের দশকে সৃষ্ট আন্দোলনের সাথে বেগম রোকেয়ার যোগসূত্র ছিল। এই বইয়ের তথ্যের সাথে অন্যান্য সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনে রোকেয়ার ভূমিকার বিষয়টি আলোকপাত করা হলো।

বিশ শতকের শুরুতেই ইউরোপ-আমেরিকায় নারীর রাজনৈতিক তথা ভোটের অধিকার প্রশ্নে বড় ধরনের পরিবর্তন শুরু হয়। এমলিয়া প্যাংকহার্স্টের নেতৃত্বে ভোটাধিকার আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং আন্দোলনের ফলে ১৯১৮ সালে ইংল্যান্ডে ত্রিশ বয়সোর্ধ্ব নারীদের ভোটাধিকার মেনে নেওয়া হয়। আন্দোলনের মাধ্যমে কানাডা, আমেরিকা, নরওয়ে, রাশিয়া, পোল্যান্ডসহ বেশ কয়েকটি দেশের নারীরা ভোটাধিকার অর্জন করে।

বিশ দশকের প্রথম দিকে যখন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বদেশি আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে, তখনই নারীর ভোটাধিকারের বিষয়টি রাজনীতি সচেতন নারীসমাজের মাঝ থেকেই উত্থাপিত হয়। ১৯১৭ সালে ভারত সচিব এডউইন মন্টেগু চেমসফোর্ড ভারত সফরে আসেন। সেই সময় ১৯১৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মহিলা প্রতিনিধিদল থেকে ১৪ জন নারী মন্টেগু চেমসফোর্ড মিশনের কাছে নারীদের ভোটাধিকার প্রদানের দাবি উত্থাপন করে সর্বপ্রথম একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

আবেদনে তাঁরা বলেন, নারীরা নাগরিক হিসেবে স্বীকৃত এবং পুরুষদের মতো প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পেতে পারে। এই ভোটাধিকারের দাবিটি গৃহীত হয়নি। আইন পরিষদে মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচনের দাবিও তাই অগ্রাহ্য থেকে যায়।

এরপর দীর্ঘদিন নারীদের ভোটাধিকারের দাবিতে নানা ধরনের আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯১৮ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নারীর ভোটাধিকারের দাবি সমর্থন করে। ১৯১৯ সালে সরোজিনী নাইডু, এ্যানি বেসান্ত, হীরা বাঈ টাটা নারীদের ভোটদানের সপক্ষে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির সাথে সাক্ষাৎ দানের জন্য লন্ডন যান। মহিলা সমাজের তীব্র আন্দোলনের চাপে মহিলাদের ভোটাধিকারের বিষয়টি প্রদেশের বিবেচনায় ছেড়ে দেওয়া হয়। এর ফলে নারীর ভোটাধিকারের ক্ষেত্র পরিবর্তন হয়ে যায় এবং বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভা ও সভ্যবৃন্দকে প্রভাবিত করার কাজ গুরুত্ব অর্জন করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯২১ সালের ১৩ আগস্ট কলকাতায় আয়োজিত মহিলাদের এক সভায় ভোটাধিকার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য 'বঙ্গীয় নারী সমাজ' নামক সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বঙ্গীয় নারী সমাজ-এ সভাপতি নির্বাচিত হন কামিনী রায়, সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হন যথাক্রমে মৃণালিনী সেন এবং কুমুদিনী বসু। শিক্ষা ও সামাজিক বিচারে এই তিন নারীই ছিলেন এলিট সম্প্রদায়ের। সামাজিক ভূমিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁদের পেছনে বড় রকম সমর্থন ছিল। নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনে এদের পাশাপাশি দাঁড়াতে রোকেয়াকে অতিক্রম করতে হয় দীর্ঘ পথ এবং পরিচালনা করতে হয় নিঃসঙ্গ সাধনা। রোকেয়ার পাশে পরিবারের কেউই ছিল না, তিনি কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর সমর্থনই পাননি। এমনকি তাঁর প্রিয় বড় বোন করিমউন্নেসার পুত্র স্যার এ কে গজনভী নারীর ভোটাধিকারের বিরোধিতা করেন।

'বঙ্গীয় নারী সমাজ' প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে তাঁরা নারীর ভোটাধিকার নিয়ে প্রকাশ্যে বিভিন্ন সভা-সমিতির আয়োজন করেন। তাঁদের প্রধান কাজ হয় ব্রিটিশের কাছে আবেদনের পাশাপাশি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের কাছে তাঁদের দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরা। এজন্য 'বঙ্গীয় নারী সমাজ' তাদের সংগঠনের ভিত্তি ও কর্মকাণ্ড প্রসার করতে বাধ্য হয়েছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুসলিম সদস্য ছিলেন ৪০ শতাংশ। মুসলিম সভ্য ও সদস্যদের মধ্যে কাজ করার জন্য 'বঙ্গীয় নারী সমাজ' দুজনের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সাড়া পেয়েছিলেন। বারবারা সাউথার্ডের দেওয়া তথ্যানুযায়ী এরা হলেন, মিসেস আরএস হোসেন অর্থাৎ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এবং বেগম সুলতানা মোয়াজ্জেদা। বারবারা সাউথার্ড তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, স্বধর্মে রক্ষণশীল অংশের সম্ভাব্য নিন্দাবাদের শঙ্কা দূরে ঠেলে যে কজন মুসলিম মহিলা নারীর ভোটাধিকারের পক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ছিলেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।

১৯২১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে ৫৬-৩৭ ভোটে নারীর ভোটাধিকারের প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়। আন্দোলনরত নারীদের জন্য এ ছিল এক করুণ অভিজ্ঞতা। ব্যক্তিগতভাবে রোকেয়ার জন্য এই অভিজ্ঞতা আরো করুণ ছিল। কারণ তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় বড় বোন করিমউন্নেসার পুত্র স্যার এ কে গজনভী ভোট দিয়েছিলেন প্রস্তাবের বিপক্ষে। ভোটের ফলাফলে দেখা যায়, যাঁরা বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ২৩ জন হিন্দু, ২৭ জন মুসলিম এবং ৬ জন খ্রিষ্টান। এরপরও আন্দোলনকারী নারীরা তাঁদের ভোটাধিকারের আন্দোলন চালিয়ে যায়। কোলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে মহিলাদের ভোটাধিকার অর্জনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে এবং ১৯২৩ সালে এ অধিকার অর্জিত হয়। এ জয় লাভে উৎসাহিত হয়ে কামিনী রায়, বেগম রোকেয়া এবং বেগম সুলতানা মোয়াজ্জেদার নেতৃত্বে এক নারী প্রতিনিধিদল লর্ড লিটনের সাথে নারীর ভোটাধিকারের সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

১৯২৫ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নতুন করে অনুষ্ঠিত ভোটে ৫৪-৩৮ ভোটে নারী ভোটাধিকার বিল পাস হয়। এবারেও ভোটের আগে রোকেয়া 'বঙ্গীয় নারী সমাজ'-এর পক্ষে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারকাজে অংশ নেন, বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠানে ও রোকেয়া বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এ পর্যায়ে সীমিত ক্ষেত্রে মহিলাদের ভোটদান অনুমোদন হলে কোলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে নারীরা ভোট দেওয়ার অধিকার অর্জন করে। এরপর ১৯২৫ সালে 'বঙ্গীয় নারী সমাজ' সংগঠন থেকে নারীর ভোটাধিকারের দাবিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন শুরু হয়।

১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতির সম্মেলনে সভানেত্রীর ভাষণে রোকেয়া নারী শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে ভোটাধিকার প্রয়োগে মুসলিম মহিলাদের অনীহা বিষয়ে তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, 'এখন স্ত্রীলোকেরা ভোটদানের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু মুসলিম মহিলাগণ এ অধিকারের সদ্ব্যবহারে স্বেচ্ছায় বঞ্চিতা রহিয়াছেন। গত ইলেকশনের সময় দেখা গেল কলিকাতার মাত্র ৪ জন স্ত্রীলোক ভোট দিয়াছে। ইহা কি মুসলমানের জন্য গৌরবের বিষয়? তাঁহারা কোন সুযোগের আশায় বা অপেক্ষায় বসিয়া আছেন।'

নারীর ভোটাধিকারের বিষয়ে রোকেয়া সবসময়ই সোচ্চার ছিলেন এবং ভোটাধিকার আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৬ সালে সর্বপ্রথম বাংলার নারীরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতের ৬০ লাখ নারীর ভোটাধিকারের আইন পাস করেন।

রোকেয়া প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডের সাথে সরাসরি যুক্ত না থাকলেও ব্রিটিশবিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের ভাবধারায় তাঁর প্রভাবিত ও উজ্জীবিত হওয়ার তথ্য থেকে বলা যায়, তিনি পরিপূর্ণভাবে রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিরূপে সকল কর্মকাণ্ড ও সাধনায় নিবেদিত ছিলেন। তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছিলেন, স্বেচ্ছাসেবী নারী বাহিনীতে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধ ও কবিতা চাষার চক্ষু, এন্ডি শিল্প, আপিল, নিরূপম বীর, কানাইলালের বীরত্ব ইত্যাদি থেকে রোকেয়ার স্বদেশ ভাবনা, স্বাধিকার এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানা যায়।

রোকেয়ার নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের পথপরিক্রমায় বাংলাদেশের নারীরা আজ শুধু ভোটারই নন, বাংলার নারী আজ ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী। গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় রোকেয়ার জন্মভূমি বাংলাদেশের নারী আজ প্রধানমন্ত্রী, সংসদনেতা, সংসদ উপনেতা, স্পিকার, মন্ত্রী, এমপিসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সফলভাবে কাজ করছেন। এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে। আমরা বলতেই পারি, বেগম রোকেয়া নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন, সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। নারীর ক্ষমতায়নে দেশে আজ শুধু রোকেয়ার স্বপ্নই পূরণ হয়নি, বিশ্বে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। এমন ইতিহাস আর সৃষ্টি হবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

বেগম রোকেয়া আমাদের মাঝে না থাকলেও রয়েছে তাঁর আদর্শ। আমরা তাঁর আদর্শ বুকে ধারণ করে যেন পথ চলতে পারি, রোকেয়া দিবসে এটাই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা।

তথ্যসূত্র:

১. মফিদুল হক- নারী মুক্তির পথিকৃৎ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-২০০৭।

২. মফিদা বেগম- আওয়ামী লীগ রাজনীতি নারী নেতৃত্ব, (১৯৪৯-২০০৯), হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা- ২০১০।

৩. মালেকা বেগম- সৈয়দ আজিজুল হক- আমি নারী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০১।

৪. বারবারা সাউথার্ড- দি উইমেন্স মুভমেন্ট এন্ড কলোনিয়াল পলিটিক্স ইন বেঙ্গল, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা- ১৯৯৬।

লেখক: সদস্য, জাতীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ

বেগম রোকেয়ার স্মরণীয় উক্তি

"মেয়েদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ জননী এবং আদর্শ নারীরূপে পরিচিত হইতে পারে।"

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের কিছু

আলোকচিত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বেগম রোকেয়া দিবস-২০২১ ও বেগম রোকেয়া পদক প্রদান অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন। (বৃহস্পতিবার, ৯ ডিসেম্বর ২০২১)

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বেগম রোকেয়া পদক-২০২১ প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নারীর অধিকার সংরক্ষণে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যশোর জেলার অর্চনা বিশ্বাসকে 'বেগম রোকেয়া পদক-২০২১' প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন। (বৃহস্পতিবার, ৯ ডিসেম্বর, ২০২১)-পিআইডি।

বেগম রোকেয়া দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা ও পদকপ্রাপ্তগণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলন। (বৃহস্পতিবার, ৯ ডিসেম্বর ২০২১)-পিআইডি।

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর ৯২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক প্রদান অনুষ্ঠান-২০২২ উপলক্ষ্যে ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদকপ্রাপ্তদের সাথে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন। (সোমবার, ৮ আগস্ট ২০২২)।

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর ৯২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক প্রদান অনুষ্ঠান-২০২২ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রচিত 'শেখ ফজিলাতুন নেছা আমার মা' বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

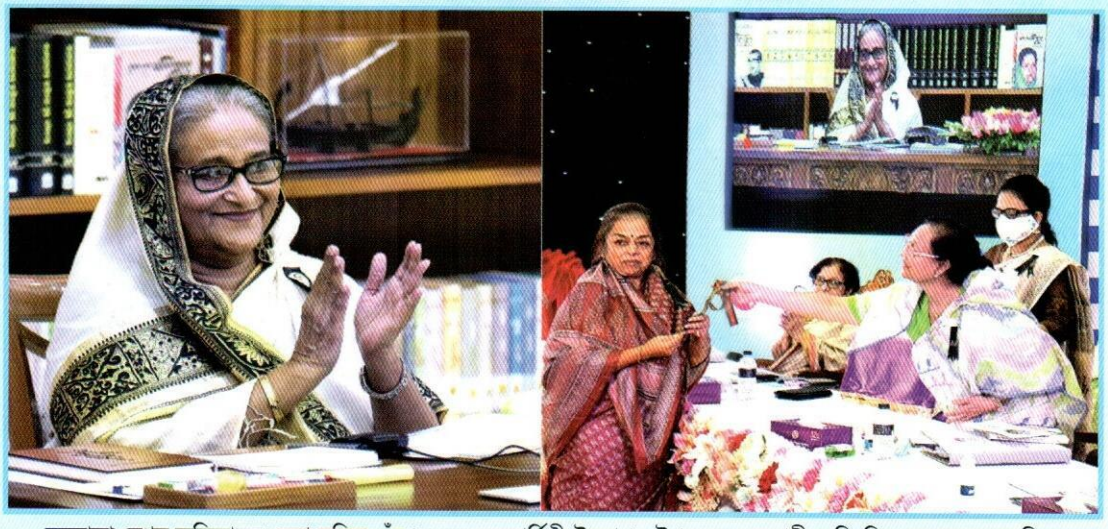

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর ৯২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা ৫ জন বিশিষ্ট নারীকে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২২' প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসময় গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন। (সোমবার, ৮ আগস্ট ২০২২)-পিআইডি

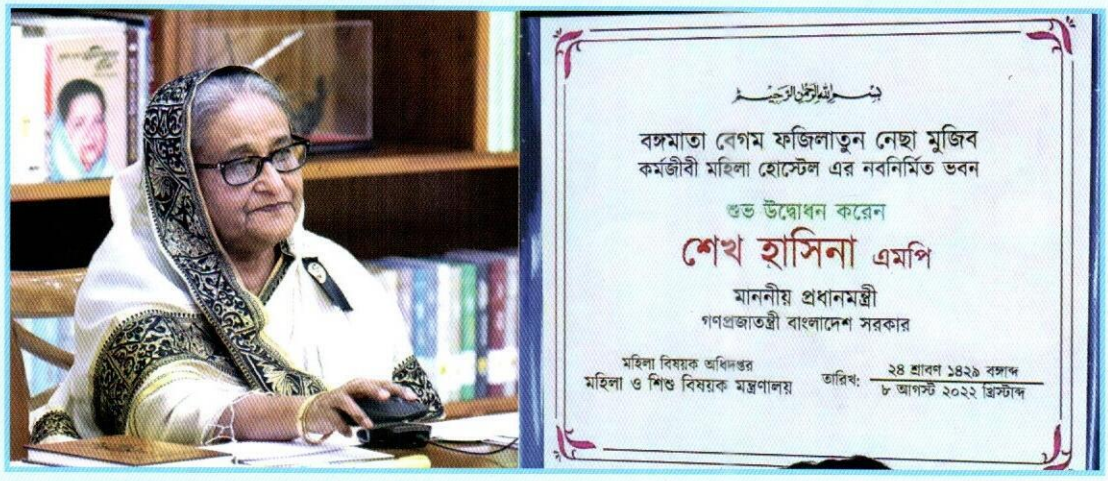

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর ৯২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কানফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন। (সোমবার, ৮ আগস্ট ২০২২)-পিআইডি

নারীর নিরাপদ যাতায়াতে গণপরিবহনে (১০০টি বাস) সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি বাংলাদেশ শিশু একাডেমী মিলনায়তনে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন। (৪ অক্টোবর, ২০২২)

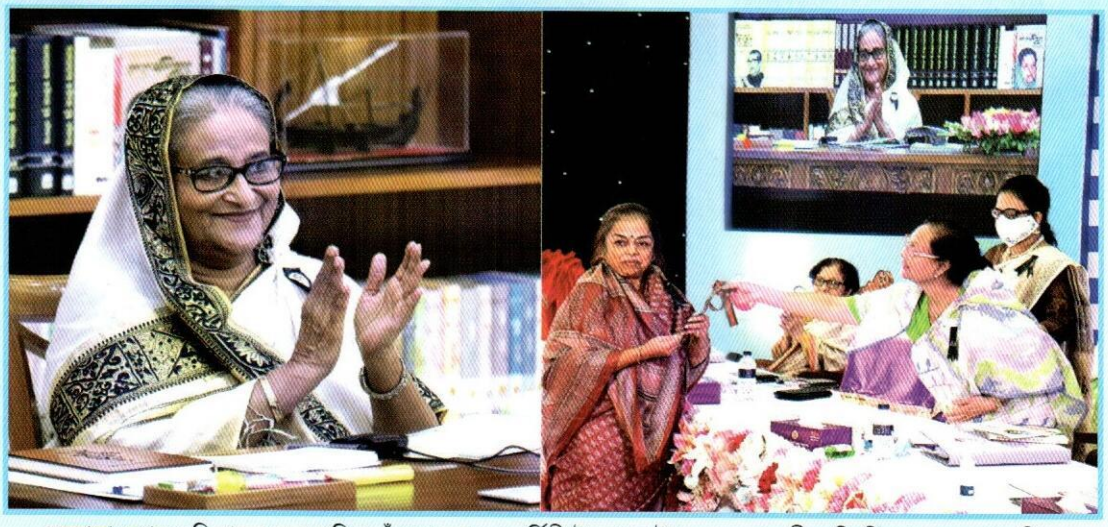

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর ৯২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা ৫ জন বিশিষ্ট নারীকে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২২' প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসময় গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন। (সোমবার, ৮ আগস্ট ২০২২)-পিআইডি

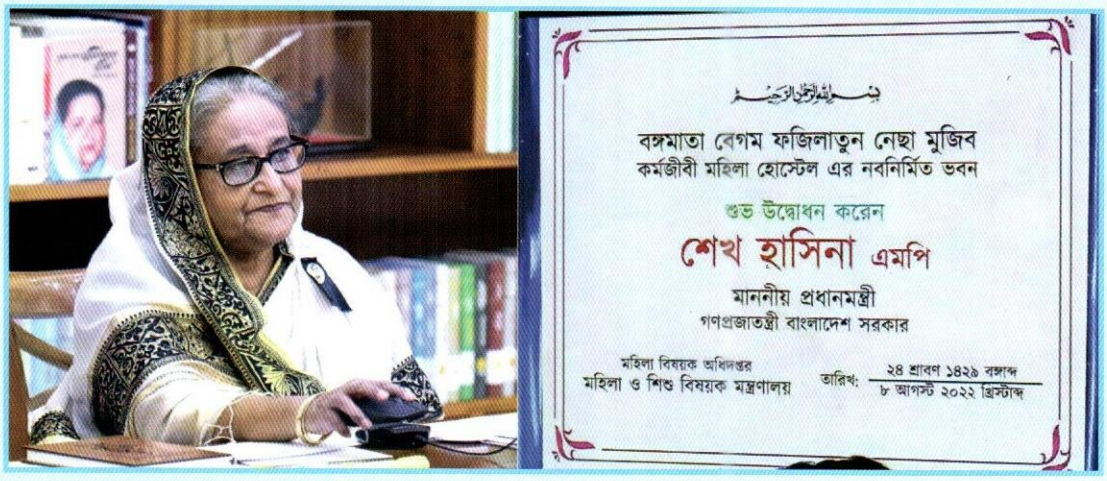

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর ৯২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কানফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন। (সোমবার, ৮ আগস্ট ২০২২)-পিআইডি

নারীর নিরাপদ যাতায়াতে গণপরিবহনে (১০০টি বাস) সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি বাংলাদেশ শিশু একাডেমী মিলনায়তনে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন। (৪ অক্টোবর, ২০২২)

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ-২০২২ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী মিলনায়তনে বিজয়ী শিশুদের সাথে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। (৩ অক্টোবর, ২০২২)

২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় স্থাপিত 'শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, মতিঝিল'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছোট শিশুদের সাথে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা ঢাকার খিলগাঁওয়ে বেগম রোকেয়া কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের দশতলা ভবনের উদ্বোধন করেন। (বৃহস্পতিবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২)-পিআইডি

খুলনা বিভাগের শ্রেষ্ঠ জয়িতাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান ২০২১-২২এ মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরার কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন একজন জয়িতা।

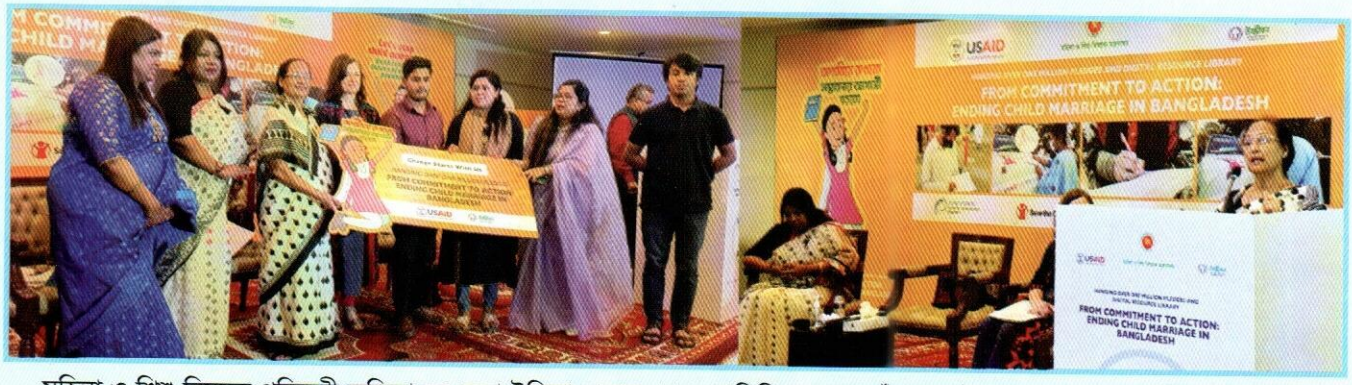

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা ঢাকায় প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে USAID আয়োজিত বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ১০ লাখ মানুষের স্বাক্ষর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। (শনিবার, ২০ আগস্ট, ২০২২)- পিআইডি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র সততা ও সাহসিকতার প্রতীক পদ্মা সেতু।

স্বপ্নের পদ্মা সেতুতে প্রথম টোল দিচ্ছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় জেলা পর্যায়ে সেলস ও ডিসপ্লে সেন্টার উদ্বোধন করেন (মঙ্গলবার, ১০ মে, ২০২২)।-পিআইডি

বেগম রোকেয়ার পারিবারিক অ্যালবাম থেকে

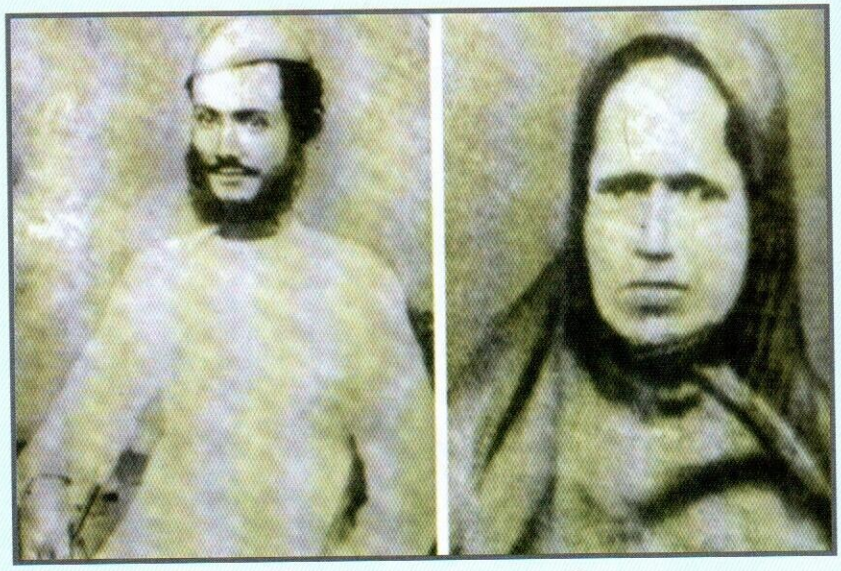

বেগম রোকেয়ার বাবা জহিরুদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের এবং মা রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরাণী

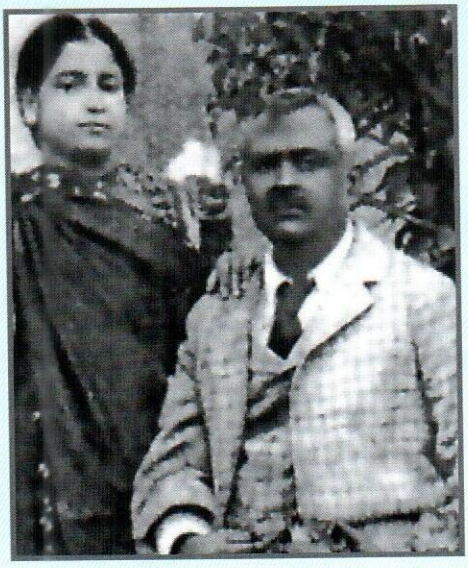

বেগম রোকেয়া ও সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন

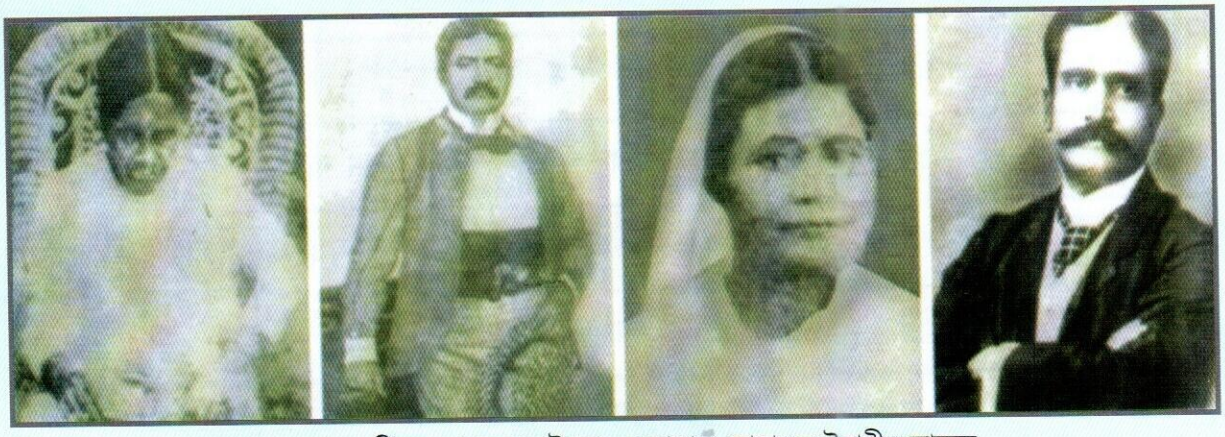

বড় বোন করিমুন্নেসা, বড় ভাই আবুল আসাদ মোহাম্মদ ইব্রাহীম সাবের,
ছোট বোন হোমায়রা তফাজ্জল হোসেন ও দ্বিতীয় ভাই আবু যায়গাম খলিল সাবের।

২০২২ সালে বেগম রোকেয়া পদকে ভূষিত

সম্মানিত ব্যক্তিগণ

রহিমা খাতুন
ক্ষেত্র : নারী শিক্ষা

প্রফেসর কামরুন নাহার বেগম (অ্যাডভোকেট)
ক্ষেত্র : নারী অধিকার

ফরিদা ইয়াসমিন
ক্ষেত্র : নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন

ড. আফরোজা পারভীন
ক্ষেত্র : সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে নারীজাগরণ

নাছিমা বেগম
ক্ষেত্র : পল্লি উন্নয়ন

১৯৯৫ সাল থেকে ২০২২ পর্যন্ত
বেগম রোকেয়া পদকে ভূষিত
সম্মানিত ব্যক্তিগণের নাম

২০২২
রহিমা খাতুন ■ প্রফেসর কামরুন নাহার বেগম (অ্যাডভোকেট)
ফরিদা ইয়াসমিন ■ ড. আফরোজা পারভীন ■ নাছিমা বেগম

২০২১
প্রফেসর হাসিনা জাকারিয়া বেলা ■ অর্চনা বিশ্বাস
শামসুন্নাহার রহমান পরাণ (মরণোত্তর) ■ অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা ■ ড. সারিয়া সুলতানা

২০২০
প্রফেসর ড. শিরীণ আখতার বেগম ■ কর্নেল ডা. নাজমা বেগম
মঞ্জুলিকা চাকমা ■ বেগম মুশতারী শফী ■ ফরিদা আক্তার

২০১৯
বেগম সেলিনা খালেক ■ অধ্যক্ষ শামসুন নাহার
ড. নুরুননাহার ফয়জননেসা (মরণোত্তর) ■ মিজ পাপড়ি বসু ■ বেগম আখতার জাহান

২০১৮
জিনাতুন নেছা তালুকদার ■ প্রফেসর জোহরা আনিস
শীলা রায় ■ রমা চৌধুরী (মরণোত্তর) ■ রোকেয়া বেগম (মরণোত্তর)

২০১৭
মিসেস সুরাইয়া রহমান ■ শোভা রানী ত্রিপুরা
বেবী মওদুদ (মরণোত্তর) ■ মাজেদা শওকত আলী ■ মাসুদা ফারুক রত্না

২০১৬
আরমা দত্ত ■ বেগম নূরজাহান

২০১৫
ড. তাউবুন নাহার রশীদ (কবিরত্ন, ডি.লিট) ■ বিবি রাসেল

২০১৪
অধ্যাপক মমতাজ বেগম ■ মিসেস গোলাপ বানু

২০১৩
প্রফেসর হামিদা বানু ■ ঝর্ণা ধারা চৌধুরী

২০১২
সৈয়দা জেবুন্নেছা হক ■ প্রফেসর মাহফুজা খানম

২০১১
বেগম মেহেরুন্নেসা খাতুন ■ অধ্যাপক হামিদা খানম (মরণোত্তর)

২০১০
অধ্যাপক মেহের কবীর ■ আয়শা জাফর

২০০৯
বেগম মমতাজ হোসেন ■ বেগম রাজিয়া হোসেইন